গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১২ নভেম্বর ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

রান্নার গ্যাস, পেট্রল, ডিজেল এবং বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে

১৭ নভেম্বর ২৪ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধ সফল করুন

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আবেদন

আপনারা জানেন, আমাদের দলের রাজ্য কমিটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত ১২ দফা দাবিতে আগামী ১৭ নভেম্বর ২৪ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধ ডেকেছে।

১। পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের বর্ধিত দাম এবং ভরতুকি তুলে নেওয়ার নীতি প্রত্যাহার করতে হবে।

২। পেট্রল-ডিজেলের উপর আরোপিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সকল ট্যাক্স ও সেস প্রত্যাহার করতে হবে।

৩। বিদ্যুতের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার করতে এবং পূর্বতন স্ল্যাব বিন্যাস বজায় রাখতে হবে। কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে।

৪। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত, বর্ধিত ফি ও ডোনেশন প্রত্যাহার; 'জীবনশৈলী'র নামে যৌনশিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

৫। হাসপাতালের বেসরকারীকরণ বন্ধ ও বর্ধিত চার্জ প্রত্যাহার করতে হবে।

৬। সকল বন্ধ কারখানা ও চা-বাগান খুলতে হবে ও ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল করতে হবে।

৭। নয়া কৃষিনীতি বাতিল, জমির বর্ধিত খাজনা ও সেচকর প্রত্যাহার করতে হবে। ফসলের ন্যায্য দাম, গ্রামীণ মজুরদের সারা বছর কাজ ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে।

৮। ঢালাও মদের দোকান খোলা, রেডি টু ড্রিঙ্ক চালু করা ও অনলাইন লটারি বন্ধ করতে হবে।

৯। বন্যা-খরা-নদীভাঙন-আর্সেনিক আক্রমণ রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০। পঞ্চায়েতি ট্যাক্স বৃদ্ধি ও সালিশি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।

১১। টু-হুইলার সহ সকল যানবাহনের উপর বর্ধিত ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে।

১২। নারীধর্ষণ, খুন, ডাকাতি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সরকারি দল-সমাজবিরোধী-পুলিশের দুষ্টচক্র ভাঙতে হবে।

আপনারা এটাও জানেন, আমাদের দল দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। এই লড়াইয়ের ফলে প্রাথমিকে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তন ও সাম্প্রতিককালে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ক্যাপিটেশন ফি প্রত্যাহার সহ বহু দাবি আদায় করতে আমাদের দল সক্ষম হয়েছে। কোন দাবি আদায় না হলেও আমরা আন্দোলন চালিয়ে যেতাম। কারণ অতীতের সব বড় মানুষরা এবং মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার বলে গেছেন, অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ না করা হচ্ছে নিজেদের মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধকে অসম্মান করা, নিজেদের কাপুরুষ প্রমাণ করা। প্রতিবাদ না করলে অত্যাচারী আরও বেপরোয়া হয়, মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না। অন্যদিকে না লড়লে চরিত্র, সাহস ও নৈতিক বল জাগে না। আবার লাগাতার আন্দোলনের পথে বহু দাবিও আদায় হয়। সম্প্রতি আমরা লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে চলছিলাম, এই সময়ে সিপিএম সমর্থিত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার জনজীবনের উপর ভয়ঙ্কর আঘাত হেনেছে রান্নার গ্যাস, ডিজেল ও পেট্রলের দাম অত্যধিক হারে বাড়িয়ে। এই পরিস্থিতিতে ৫ নভেম্বর আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং ঐদিনই দেশব্যাপী রাজ্যে রাজ্যে আমরা বিক্ষোভ মিছিল করেছি। আমাদের দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ঐদিনই কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে। ইতিমধ্যে কলকাতা ও বিভিন্ন জেলার বহু নাগরিক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানান যে, এস ইউ সি আই একমাত্র দল, যে সবসময় জনগণের স্বার্থে লড়াই করে এবং আমরা যেন কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করি। এই অবস্থায় আমাদের দল ১৭ নভেম্বর, রাশিয়ার ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহ্যপূর্ণ দিনে ২৪ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধ ডেকেছে।

এটা লক্ষণীয় যে, আন্তর্জাতিক বাজারে যখন তেলের দাম কমছে তখন সিপিএম সমর্থিত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার পূর্বতন তৃণমূল সমর্থিত বিজেপি

ছয়ের পাতায় দেখুন

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ৫ নভেম্বর রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ

কলকাতা

বাঙ্গালোর

হায়দ্রাবাদ

অনিল বিশ্বাসের বন্‌ধবিরোধী প্রশ্নের জবাবে

সমস্যায় জেরবার মানুষের প্রতিবাদের ভাষাকে মূল্য দিয়ে এস ইউ সি আই আগামী ১৭ নভেম্বর ২৪ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধ ডেকেছে। এই বন্‌ধের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস প্রশ্ন তুলেছেন —

(১) দাম বাড়িয়েছে কেন্দ্র, রাজ্যে তা নিয়ে বন্‌ধ হবে কেন? (২) পেট্রল-ডিজেল থেকে রাজ্য সরকার যদি ট্যাক্স তুলে নেয় তাহলে সরকার চলবে কীভাবে ? (৩) এই বন্‌ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে। (৪) এই বন্‌ধ বামফ্রন্টকে হেয় করার জন্য।

অনিলবাবুর কি মনে পড়ে, গত ২৭ বছরে তারা কতবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরকারি ছুটির বাংলা বন্‌ধ করেছেন? সংখ্যাটা এতই যে নথি না ঘেঁটে বোধহয় তাঁরা বলতেই পারবেন না। তাছাড়া অনিলবাবু, কেন্দ্রে কারা রয়েছে? যে সিপিএমের সমর্থন নিয়ে কংগ্রেস পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ায় সেই সিপিএমের কর্ণকুহরে প্রতিবাদের ভাষা পৌঁছে দিতে উপযুক্ত স্থল সেটাই যেখানে সিপিএম ক্ষমতায়। তাছাড়া, রাজ্যেও সিপিএমের শাসন জনগণের বিরুদ্ধে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এই বন্‌ধ। ফলে বাংলায় বন্‌ধ করে কী হবে এ প্রশ্ন অবান্তর। তাছাড়া সর্বভারতীয় অন্যায়ের প্রতিবাদ বাংলার কোন প্রান্তে হতে পারে না একথা তাদের মুখেই মানায় যারা অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক। ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাকালে এই বাংলার কয়েকটি জেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সেই আন্দোলনগুলি স্বাধীনতা আন্দোলনকে মহিমান্বিত করেছিল। সেদিন কেউ এ প্রশ্ন তোলেননি যে বাংলায় প্রতিবাদ করে কী হবে? ইংরেজ কি হঠবে? এসব প্রশ্ন তারাই তোলে, যারা আন্দোলন চায় না, যারা শোষণের পক্ষে, যারা জনগণকে প্রতিবাদহীন জড়বস্তুতে পরিণত করতে চায়।

অনিলবাবু করবৃদ্ধির পক্ষে সাফাই দিতে বলেছেন, রাজ্য সরকার যদি কর, সেস্ তুলে দেয় তাহলে সরকার চলবে কীভাবে? শিল্পপতিদের কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দিয়ে সরকারটা চলছে কীভাবে অনিলবাবু? শিল্পপতিদের বিনামূল্যে জমি, জল, সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার বেলায় এই যুক্তি তো আপনারা তোলেন না? বুর্জোয়াদের কোটি কোটি টাকা ভর্তুকির বেলায় তো এ প্রশ্ন ওঠে না।

তিনের পাতায় দেখুন

পুরুলিয়া

বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের জয়

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত পুরুলিয়া জেলা বিড়ি শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে গত ১৫ অক্টোবর বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদানসহ অন্যান্য দাবিতে প্রায় তিন শতাধিক বিড়ি শ্রমিক আড়ষা বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেয়। দু'ঘণ্টা অবরোধ চলার পর ব্লক আধিকারিক শ্রমিকদের পরিচয়পত্রের দাবি মেনে নেন এবং তাদের দাবি অনুযায়ী এলাকায় গিয়ে ক্যাম্প করে ব্লক আধিকারিক ও ওয়েজ ইন্সপেক্টর নিজেরা গত ৪ নভেম্বর পরিচয়পত্র প্রদান করেন।

আন্দোলনের এই জয়ে শ্রমিকরা উৎসাহিত। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণ। সংগঠনের জেলা সংগঠক কমরেড রঙ্গলাল কুমার শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন — এই জয় সংগঠনকে আরো সংগঠিত ও আন্দোলনকে সুতীব্র করতে সাহায্য করবে।

রাজ্য পর্যটন বিভাগের কর্মচারীদের আন্দোলন

রাজ্য পর্যটন দপ্তরে সিপিএমের কর্মচারী সংগঠন ভাঙছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সিপিএম-ভজা আন্দোলনবিমুখ নীতির প্রতিবাদে কর্মচারীরা সংগ্রামী সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর সদস্যপদ গ্রহণ করছেন। এই সংগঠনের নেতৃত্বে গত ২ থেকে ৫ নভেম্বর পর্যটন বিভাগের অধীন ট্যুরিজম সেন্টার (৩/২ বি-বা-দি বাগ পূর্ব) এর কর্মচারীরা লাগাতার অনশনের কর্মসূচি পালন করেন। তাঁদের দাবি সরকারি লজগুলিকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না, রি-ডিপ্লয়মেন্টের নামে কর্ম ও কর্মীসংকোচন করা চলবে না, অবিলম্বে শূন্যপদে বেকার যুবকদের নিয়োগ করতে হবে, ৩৭ মাস ধরে বকেয়া ওভারটাইম ভাতা মিটিয়ে দিতে হবে, আমলাদের লাগামছাড়া দুর্নীতি ও অর্থের অপচয় বন্ধ করতে হবে, নিয়ম বহির্ভূতভাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশনের নেতাদের পদোন্নতি দিয়ে যোগ্যকর্মচারীদের বঞ্চিত করা চলবে না। এদিনের অনশন কর্মসূচিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবির প্রতি উদাসীন কিন্তু মালিকদের স্বার্থরক্ষায় সদা তৎপর।

রাজ্য পর্যটন দপ্তরে বেসরকারীকরণের নেপথ্যে রয়েছে ব্রিটিশ সরকারের শর্তাবলী। এদেরই নির্দেশে সরকারি লজে কর্মী উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা, রি-ডিপ্লয়মেন্ট, আর্লি-রিটায়ারমেন্ট স্কীম নেওয়া হয়েছে, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে বেসরকারীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। কেন্দ্রের পূর্বতন বিজেপি জোট সরকার যখন বেসরকারীকরণ করত সিপিএম তাদের নাম দিয়েছিল বেচারাম সরকার। এ রাজ্যে সিপিএমই আজ বেসরকারীকরণের উদ্‌গাতা। বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষার যে রাজনীতি কংগ্রেস-বিজেপিকে সরাসরি বেসরকারীকরণের পথে ঠেলছে সেই বুর্জোয়া রাজনীতি সিপিএমকে মুখে বেসরকারী-করণের বিরোধিতা এবং বাস্তবে বেসরকারীকরণ কার্যকরী করার পথে চালিত করছে। এদের দ্বারা বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাস্তবত সম্ভব নয়। আজকের শ্রমিক আন্দোলনে তাই সংগ্রামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নটি অতীব জরুরী।

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচি

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা ৪ নভেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বছরের পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করে বলেন — পর্ষদের তত্ত্বাবধানে পূর্ববর্তী বছরগুলির ন্যায় বর্তমান শিক্ষাবর্ষেও প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এটি চতুর্দশ বর্ষের পরীক্ষা।

বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি। চলবে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

১৫ ফেব্রুয়ারি - মাতৃভাষা-সাহিত্য
১৬ ফেব্রুয়ারি - গণিত
১৭ ফেব্রুয়ারি - ইতিহাস-ভূগোল
১৮ ফেব্রুয়ারি - বিজ্ঞান
১৯ ফেব্রুয়ারি - ইংরাজী

* ফরম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৪

* বাংলা ও হিন্দী মাধ্যম সমস্ত বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

* মোট ৪০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

* এপ্রিল মাসে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে মার্কসীট দেওয়া হবে।

* উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ছয় মাসের মধ্যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

* নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। (গত বছর ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল যার অর্থমূল্য প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।)

রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির ফলে এ রাজ্যের শিক্ষার মান ভয়াবহভাবে নেমে গেছে। এ রাজ্য শিক্ষায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ফলে শিক্ষার মানের চরম অবনমন ঘটেছে এবং শিক্ষা ক্রমশ আকর্ষণহীন হয়ে পড়েছে। প্রবল জনমতের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে রাজ্য সরকার প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি চালু করতে বাধ্য হলেও ইংরেজি বইগুলি সুষ্ঠুভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে না এবং এই বইগুলির মান আদৌ আশানুরূপ নয়। পাশ-ফেল প্রথা চালুর দাবি সরকার কার্যকরী না করে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত তা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিক্ষার এই ভয়াবহ অবস্থা লক্ষ্য করে শিক্ষার মানোন্নয়নকল্পে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করে চলেছে। এই প্রচেষ্টার ফলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার প্রতি অনেকখানি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে এবং মানের অবনমন প্রতিরোধ করে তাকে উন্নত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় ছাত্র-যুবদের উদ্যোগে অসংখ্য ফ্রি-কোচিং ক্লাসও চলছে। শিক্ষক মহাশয়গণও স্কুলের নির্ধারিত সময়ের পরে অনেক জায়গায় স্পেশাল ক্লাস নিচ্ছেন। শিক্ষা আবার কিছুটা হলেও প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

এর ফলে সরকার আতঙ্কিত। তারা নানাভাবে হুমকি দিয়ে এবং অপপ্রচার করে এই পরীক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। কিন্তু বিপুল জনসমর্থনের ভিত্তিতে এই পরীক্ষা ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা বিশ্বাস করি, আগামী দিনেও সর্বস্তরের মানুষ এই পরীক্ষাকে সমর্থন জুগিয়ে যাবেন।

আমরা পর্ষদের পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অভিভাবকদের ব্যাপকভাবে বৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠানোর আবেদন জানানোর সাথে সাথে সমস্ত স্কুলে পাশ-ফেল প্রথা চালু করার জন্যও সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

এস ইউ সি আই-এর

কলকাতা জেলা সম্মেলন

বুর্জোয়াশ্রেণীর তীব্র শোষণে জনজীবন বিপর্যস্ত, অথচ তাদের স্বার্থে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বাস্তবে এস ইউ সি আই ছাড়া কেউ নেই। এই অবস্থায় আমাদের দলের প্রতি জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে সংগঠনকে আরও গতিশীল এবং আদর্শগত দিক থেকে আরও বলীয়ান করে ইতিহাস অর্পিত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে গত ১০ অক্টোবর দলের কলকাতা জেলার দ্বিতীয় সাংগঠনিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় মৌলালি যুবকেন্দ্রে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, শহীদ বেদিতে মাল্যদান করেন জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কালিকা মুখার্জী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমরেডস্ প্রতিভা মুখার্জী, ছায়া মুখার্জী, সৌমেন বসু, সাধনা চৌধুরী. চিররঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের পর জেলায় প্রয়াত কমরেডদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। জেলা সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এই প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। বহু প্রতিনিধি লিখিতভাবে তাদের সংশোধনী-সংযোজনী পেশ করেন। অবশেষে সেগুলি বিবেচনা সাপেক্ষে জেলা সম্পাদকের রিপোর্ট ও আয়ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে কমরেড মানিক মুখার্জীকে সম্পাদক হিসাবে পুনর্নির্বাচিত করে ২৫ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

বিকাল ৫টায় প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ পার্টির ইতিহাসে কলকাতা জেলা পার্টির গৌরবময় ভূমিকার কথা

কমরেডদের স্মরণ করিয়ে দেন। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, দলের বহু কর্মী কঠোর পরিশ্রম করেন অথচ আদর্শগত মানোন্নয়নের সংগ্রামে যথোপযুক্ত যত্নবান হননি, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের মর্মার্থ উপলব্ধির সংগ্রামে পিছিয়ে আছেন। প্রকৃত কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ এক গুরুতর বাধা যাকে অতিক্রম করতে হবে। কমরেড প্রভাস ঘোষ উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার অনুশীলন করা, ব্যক্তিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং সংগঠনের ভিত্তি সুদৃঢ় করার আহ্বান জানান।

ঘাটশিলায় দু'দিনের রাজনৈতিক ক্লাস

৩০-৩১ অক্টোবর ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ঘাটশিলায় মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলার এস ইউ সি আই কর্মীদের দুই দিনের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষাশিবিরে তিনটি জেলার ৮২৬ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। ৩০ অক্টোবর সকাল ৯টায় দলের পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ, দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস্ প্রশান্ত ঘটক, মানব বেরা, হুগলি জেলা সম্পাদক কমরেড পরিমল সেন, রাজ্য শ্রমিক নেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য রাজ্য ফিজিক্যাল ট্রেনার কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এরপর ক্লাস শুরু হয়। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের 'নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন' ও 'বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি' এই দু'টি বইয়ের উপর কর্মীদের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। কর্মীরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে কমরেড রাজ্য সম্পাদকের আলোচনা শোনেন। দুদিনের এই রাজনৈতিক ক্লাসে রাজনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি শরীরচর্চা, প্যারেড শেখানো হয়। উপস্থিত কর্মীদের সংখ্যার তুলনায় থাকার জায়গার অভাব, জলের সংকট ইত্যাদির মধ্যেও কমরেডরা বিপ্লবী নিয়ম শৃঙ্খলায় অবিচল ছিলেন। রাজ্য সম্পাদকের দু'দিনের এই আলোচনা, শিক্ষাকেন্দ্রের সামগ্রিক পরিবেশ অংশগ্রহণকারীদের মনে উদ্দীপনা ও গভীর প্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

পুঁজিবাদকে সেবা করার রাজনীতিই সিপিএমকে দুর্বৃত্ত নির্ভর করেছে

হাতকাটা দিলীপ-কাণ্ডে দু'কান কাটা যাওয়ার পর সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস সাফাই গেয়ে বলেছেন — মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর কোন অপরাধ নেই এবং তাঁদের দল দুষ্কৃতীদের প্রশ্রয় দেয় না। বলা বাহুল্য, এই বিবৃতির দ্বারা লোকহাসানো ছাড়া আর কিছুই হয়নি। বৌবাজার বিস্ফোরণের ঘটনায় মাফিয়া রশিদের সঙ্গে সিপিএম নেতাদের যোগাযোগের ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার পর থেকে পলাশ, পিনাকি, স্বপন, বুল্টন — এমন বহু নাম উঠে এসেছে। সিপিএম যে অপরাধীদের শুধু প্রশ্রয় নয় আশ্রয় দেয়, লালন পালন করে, ভোটে কাজে লাগায় — তা অবিসংবাদিত সত্য। সাধারণ মানুষও ক্রমশ এসব ঘটনায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে ধরেই নিয়েছে শাসকদলের এটাই রীতি, কংগ্রেস, বিজেপি বা সিপিএম কেউ ব্যতিক্রম নয়।

সংবাদপত্রও সিপিএম নেতাদের শুদ্ধীকরণ কর্মসূচির সমালোচনায় ব্যঙ্গ করে কম্বলের লোম বাছা বলেছে; তারা বলেছে এতে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

সিপিএম দলের দুর্বৃত্তায়ন নিয়ে যেসব বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে, তাতে মূলত দুটি কারণ দেখানো হচ্ছে।

১। ভোটে কারচুপি করার প্রয়োজনে সিপিএম নেতারা সমাজবিরোধীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে, সরকারি ক্ষমতার সুযোগ নিতে আখের গোছাতে বেনোজলের মতো লোকেরা দলে ঢুকে পড়েছে।

২। এককালে সিপিএমের রুক্ষ চুল ঝোলা ব্যাগ কাঁধে ঘোরা সৎ নেতা ও কর্মীরা ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায়, এসব নতুন ঢোকা লোকেরাই দলে প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে।

সংবাদপত্রে এও লিখেছে যে সিপিএম রাজত্বে দলতন্ত্র এমনভাবে এ রাজ্যে চেপে বসেছে যে প্রশাসনের কোন ভূমিকাই নেই। শাসক সিপিএম সার্টিফিকেট দিলেই সাত খুন মাপ।

উপর থেকে দেখলে মনে হবে এগুলি সবই সত্য কিন্তু এর গভীরে আরও কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলি সংবাদপত্র তুলছে না। তা হল সরকারি ক্ষমতার সুযোগ নিতে বেনোজল দলে যখন ঢুকল সিপিএম নেতৃত্ব তা মেনে নিল কেন? কেনই বা পুরনো দিনের সৎ সিপিএম কর্মী ও নেতারা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেন। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা প্রায় মুছে দিয়ে নিরঙ্কুশ দলীয় আধিপত্য কায়েম করেছে যে সিপিএম তার নির্বাচনী তহবিলে অকাতরে কেন টাকা ঢালছে একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠী? রাজ্যের শাসকদল হিসাবে সিপিএম যত ক্ষমতারই অধিকারী হোক, কেন্দ্রের ক্ষমতা তার চেয়ে বেশি; সকলের চেয়ে বেশি ক্ষমতার অধিকারী একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী, যাদের টাকায় এসব দল পুষ্ট হয়। কাজেই দুষ্কৃতীদের প্রশ্রয়দাতা, নিকৃষ্ট দলবাজির প্রতিষ্ঠাতা সিপিএমকে ২৭ বছর এ রাজ্যের ক্ষমতায় বসে থাকতে দিচ্ছে কেন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা? এই মূল প্রশ্নটি কোন সংবাদপত্রই তোলেনি।

সিপিএম খুব জনপ্রিয় কিংবা তাদের সাংগঠনিক জালিকা জনগণের তৃণমূল স্তরে ছড়ানো — এজন্যই তাদের সরকার হাজারো অপরাধ করেও ক্ষমতায় টিকে আছে বা তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে রাখা হয়েছে — এটা অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। ভোটে জেতা দিয়েই প্রমাণ হয় না যে, সিপিএমের পিছনে প্রবল সমর্থন আছে। পশ্চিমবঙ্গের একজন শিশুও এখন জানে যে, সিপিএম বারবার নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে জিতছে জনপ্রিয়তার কারণে নয়, জালিয়াতির জোরে। আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমে জর্জ বুশের বিরুদ্ধতা করা সত্ত্বেও, জর্জ বুশ যেভাবে জালিয়াতি করে নির্বাচনে জিতেছে, এ রাজ্যে সিপিএমের জয়ের পিছনকার রহস্যও সেটাই। তাছাড়া জনপ্রিয়তাই যদি সরকারের টিকে থাকার কারণ হয়, তাহলে ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার, যার মধ্যে সিপিএমও ছিল, তার জনপ্রিয়তা বর্তমান সিপিএম সরকারের চেয়ে বহু বহুগুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও মালিকশ্রেণী কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে সেই সরকারকে ক্ষমতা থেকে ফেলে দিয়েছিল কেন? জনপ্রিয়তার নিরিখে '৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট আজও তুলনাহীন। সেই সরকারকে অন্যায়ভাবে ফেলে দিলে গণবিক্ষোভে রাজ্য অচল হয়ে যাবে জেনেও মালিকশ্রেণী সেই সরকারকে ফেলে দিয়েছিল, অথচ চরম দুর্নীতিগ্রস্ত জেনেও সিপিএমকে আজ সেই মালিকশ্রেণীই ২৭ বছর ক্ষমতায় রেখেছে। কারণ একটাই, সিপিএম এখন আদ্যন্ত মালিকশ্রেণীর স্বার্থেরই রক্ষক।

সিপিএমের সমর্থকরা তো বটেই, এমনকী ওই দলের অনেক সৎ কর্মীও মনে করেন, তাদের দলের এই অধঃপতন ঘটেছে সরকারি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যই। আগে যেহেতু সিপিএম নেতৃত্ব লড়াই সংগ্রামে থাকত, কর্মীদের মধ্যেও সততা ছিল, সেহেতু সৎ কর্মীরা ধরে নেন, সেসময় সিপিএম যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি ছিল। আমাদের মতে এই চিন্তা ও ধারণাটাই ভ্রান্ত। সিপিএমের তথাকথিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন ব্যাখ্যা করে এস ইউ সি আই বহুকাল আগেই দেখিয়েছে, ভারতের মতো একটি পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই ভ্রান্ত তত্ত্ব আসলে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারে যাওয়ার রাজনৈতিক লাইন ছাড়া কিছুই নয়। '৫০ ও '৬০-এর দশকে গণআন্দোলনে সিপিএম নেতৃত্ব ছিল গদিতে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যই। সেই গদি যখন নেতাদের পুরোপুরি হস্তগত হল, তখন আগের লড়াই আন্দোলনে তাদের যতটুকু ভূমিকা ছিল, সেটাও চলে গেল, তার আর প্রয়োজন রইল না। সরকারে টিকে থাকার জন্য যেটা দরকার একদিকে পুঁজিপতিশ্রেণীর আশীর্বাদ, মদত, সমর্থন, অন্যদিকে ভোটে জালিয়াতির ক্ষমতা — এই দুটিই সিপিএম নেতৃত্ব আয়ত্ত করে নিল। ভারতবর্ষের যেকোন বুর্জোয়া পার্টির ক্ষমতায় যাওয়া ও তা ধরে রাখার কারণগুলির দিকে তাকালেই দেখা যাবে, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সকল দলেরই হাতিয়ার ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই দুটি। তাহলে, পুঁজিবাদের সেবা করার যে রাজনীতি চর্চা করে বুর্জোয়া দলগুলো দুর্বৃত্তদের আখড়া হয়ে গেল, সেই একই রাজনীতির চর্চা করে সিপিএম দুর্বৃত্তায়নের বাইরে থাকবে কোন্ যাদুতে?

পুঁজিবাদ মানে কেবল একটা শোষণমূলক আর্থিক ব্যবস্থাই নয়, শোষণের অর্থনীতি-রাজনীতিকে ভিত্তি করেই পুঁজিবাদের একটা দূষিত নোংরা সংস্কৃতিও আছে। যারা পুঁজিবাদের সেবা করে তারা এই নোংরা সংস্কৃতির শিকার হয়ে যায়, তার থেকে মুক্ত হতে পারে না। সিপিএম নেতৃত্বও সরকারে বসার ও থাকার জন্য পুঁজিবাদেরই সেবা করে যাচ্ছে, যার অনিবার্য পরিণতিতে তারা বিষাক্ত পুঁজিবাদী সংস্কৃতিরও ধারক হয়ে গেছে, তার হাত থেকে বেরোতে পারছে না। এর হাত থেকে মুক্ত হতে হলে পুঁজিবাদকে সেবা করার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। কোন দল যদি এই ব্যবস্থায় সরকারেও যায়, তবে সেখানেও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধ শক্তি (অ্যান্টি থিসিস) হিসাবে তাকে কাজ করতে হবে। এই বিরুদ্ধ শক্তির ভূমিকাই এস ইউ সি আই ১৯৬৭ ও '৬৯ সালের দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক হয়েও পালন করে গিয়েছিল যেজন্যই পুঁজিবাদী সংস্কৃতির কলুষ এস ইউ সি আইকে স্পর্শ করতে পারেনি। সিপিএম নেতৃত্ব সরকারি ক্ষমতায় বসেছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধ শক্তির ভূমিকা পালন করার জন্য নয়, পুঁজিবাদকে সেবা করার জন্য। তাই সিপিএমের উপর থেকে নীচুতলা পর্যন্ত পুঁজিবাদী সংস্কৃতির যাবতীয় কদর্যতায় কলুষিত। অনেকে বলছেন, সিপিএম দলে বেনোজল ঢুকে যাচ্ছে? কিন্তু সিপিএমের দরজা কি খোলা, যার ইচ্ছা সে ঢুকে যাচ্ছে ? আসলে এদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে, ঢোকানো হচ্ছে এবং সেটা দলের নেতাদের সম্মতি ও জ্ঞাতসারেই। নেতৃত্ব না চাইলে দলের নীচুতলার সাধারণ সদস্যদের ক্ষমতা নেই দাগীদের দলে ঢোকায়। আসলে সাধারণ মানুষ ও সিপিএমের সৎ কর্মীরা যাদের বেনোজল মনে করেন, নেতৃত্বের কাছে তারাই দলের সম্পদ। তাছাড়া অধঃপতিত ব্যক্তিরা বাইরে থেকে দলে ঢুকছে ও তার দ্বারা দল নষ্ট হচ্ছে এটাও পূর্ণ সত্য নয়। সিপিএম করতে করতেই যেসব কর্মীরা সৎ থেকে অসৎ দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে, দাগী অপরাধী হচ্ছে, নৈতিক চরিত্রে অধঃপতিত হয়ে যাচ্ছে — এদের সংখ্যাও তো সিপিএমে বিরাট। এবং এই বৈশিষ্ট্য তো কোনও একটা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নেই, সারা রাজ্যের সর্বত্র এই চেহারা। এটা ঘটল কেন? আসলে সবটাই জড়িয়ে আছে সিপিএম নেতৃত্বের রাজনীতির সঙ্গে, যেটা পুঁজিবাদকে সেবা করার রাজনীতি। এই রাজনীতিও চলবে, আবার দলের শুদ্ধীকরণও হবে — এটা নিতান্তই লোকঠকানো চালাকি।

প্রশ্ন উঠতে পারে সংবাদপত্রের মালিকরা নিজেরাই পচাগলা পুঁজিবাদী সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়েও কেন সিপিএমের দুর্নীতি ও অধঃপতন নিয়ে এত সোরগোল তুলছে, এত প্রচার করছে? একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সিপিএম সরকারের দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি স্বার্থরক্ষাকারী নীতিগুলিকে 'বাস্তববাদী' আখ্যা দিয়ে তার প্রশংসায় সংবাদপত্রের মালিকরা পঞ্চমুখ। সিপিএমের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন নিয়ে তাদের এই সোরগোলের উদ্দেশ্য একটাই, তা হল সিপিএমকে মার্ক্সবাদী ও কমিউনিস্ট বলে দেখিয়ে মার্ক্সবাদ ও কমিউনিজমের মহান আদর্শকে জনগণের চোখে হেয় করা, তার প্রতি বিরূপ করে তোলা যাতে পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত জনগণ সাম্যবাদী আদর্শের মধ্যে মুক্তির পথ না খোঁজে। সংবাদপত্রের বুর্জোয়া মালিকশ্রেণীর এই ষড়যন্ত্রের শিকার না হওয়ার জন্য জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, সিপিএম কোনদিনই কমিউনিস্ট দল ছিল না, এবং ক্ষমতায় বসে সরাসরি পুঁজিবাদকে সেবা করার ফলেই সিপিএম দলের সর্বাঙ্গে আজ পচাগলা পুঁজিবাদী সংস্কৃতির চিহ্নগুলি ফুটে উঠেছে।

পুরুষ পুলিশ দিয়েই দিনে-রাতে যেকোন সময়ে মহিলাদের গ্রেপ্তার করা যাবে — সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের প্রতিবাদে, ক্রমবর্ধমান নারীনির্যাতন ও নারীপাচার বন্ধ ও টিভিতে অশ্লীলতা ও নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শন বন্ধের দাবিতে

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ডাকে

১লা ডিসেম্বর

দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনের সামনে

মহিলা বিক্ষোভ

অনিল বিশ্বাসের জবাবে

একের পাতার পর

তাহলে জনগণের স্বার্থে ভর্তুকি দিতে আপত্তি কেন? তাহলে কি বুঝতে হবে অনিলবাবু, আপনারা আর রাখঢাক না করে মুখোশের আড়ালে নয় মুখোমুখি বুর্জোয়াদের সেবায় আত্মনিবেদন করেছেন? ভাল, জনগণের বুঝতে সুবিধা হল। লেনিন যাকে বলেছেন, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক আবরণ, সেটাও আপনাদের খসে গেল।

অনিলবাবুর কণ্ঠে বামপন্থী মানুষেরা আজ কী শুনছেন? অনিলবাবু বলেছেন, এই বন্‌ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে। বটেই তো, জনগণের উপর শোষণ অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার যে সুশৃঙ্খলিত কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধাচরণকে সর্বযুগে শোষকশ্রেণী বিশৃঙ্খলা বলেই চিৎকার করে। আর এই শৃঙ্খলা রূপ শৃঙ্খল ভাঙতে মুক্তিকামী মানুষের এই 'বিশৃঙ্খলার' প্রয়োজন আছে। মানবতাবাদী রমা রলাঁর কণ্ঠেও তাই ধ্বনিত হয়েছিল — 'Where order is injustice, disorder is the begining of justice'.

অনিলবাবু দলীয় কর্মী সমর্থকদের বিভ্রান্ত করতে বলেছেন, এই বন্‌ধ বামফ্রন্টকে হেয় করবার জন্য ডাকা হয়েছে। বামফ্রন্টকে হেয় করেছেন সিপিএম নেতারাই। সরকার পরিচালনায় বুর্জোয়াদলগুলির মত নীতি নিয়ে, নির্বাচনে হাত ও কাস্তে-হাতুড়ি তারার সংযুক্ত ছবি, সোনিয়া গান্ধীর ছবি নিয়ে ভোটে প্রচার করে, '১১০০ সিপিএম কর্মী'র ঘাতকদের দলের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেন্দ্রের সরকার পরিচালনায় অংশ নিয়ে, শ্রমিক কর্মচারীবিরোধী এবং আন্দোলনবিরোধী অবস্থান নিয়ে, সর্বোপরি বাস্তবতার দোহাই দিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সেবাদাস হয়ে, ভোটে জিততে ক্রিমিনালদের দলে টেনে এবং দলের সৎকর্মীদের অপাংক্তেয় করে দিয়ে নিজেরাই জনগণের কাছে ও বামপন্থী চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে নিজেদেরকে হেয় করেছেন। বামফ্রন্টের হেয় হওয়ার আর কিছু কি বাকি আছে? এজন্য অন্য কারোর কি প্রয়োজন আছে? সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা এই দিকটি গভীরে ভেবে দেখবেন। সিপিএম যথার্থ কমিউনিস্ট দল হিসাবে গড়ে ওঠেনি বলেই বুর্জোয়া কংগ্রেসকে মিত্র ভাবছে এবং তাদের বিপ্লবের ভুল তত্ত্বই দল গঠনের শুরু থেকে অদ্যাবধি তাদেরকে বারবার বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার পথে ঠেলে দিয়েছে।

পরিশেষে যারা প্রশ্ন তুলেছেন এই উৎসবময় পরিবেশে আন্দোলন, বন্‌ধ কেন? তাঁরা প্রশ্ন করুন কংগ্রেস-সিপিএমের জোট সরকারকে, কেন এই উৎসবময় পরিবেশে মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপানো হলো? জনগণের উপর নেমে আসা এই আক্রমণের কার্যকরী প্রতিবাদ না করতে পারলে ক্রমাগত আক্রমণ থেকে বাঁচার পথ কোথায়? ভেবে দেখুন।

নভেম্বর বিপ্লব কী এনেছিল

[১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রুশ দেশের জনসাধারণের জীবনে কী যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল, তা এখন দুনিয়ার পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা মানুষকে জানতে দিতে চায়না; তাদের ভয়, আজকের ছাত্র-যুব শোষিত মানুষ তা গভীরভাবে জানলে আবার পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার বল পাবে, তার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। আর ঠিক এ কারণেই আমরা দেশের শ্রমজীবী জনগণকে, ছাত্র-যুব শক্তিকে নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যের ইতিহাস জানাতে চাই। এই লক্ষ্য নিয়েই প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক সিডনি ওয়েব তাঁর সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন ১৯৩৬-৩৭ সালে। 'দি ফিউচার অফ্ সোভিয়েট কমিউনিজম' নামে তার একটি লেখার অনুবাদ, আমরা মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৮৭তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশ করছি। — সম্পাদক, গণদাবী]

যাঁরা সাধারণ মানুষের মনের খবর রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, বলশেভিক রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের মনোভাবে একটা নতুন পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম প্রথম তো এর টিকে থাকার ব্যাপারেই বিশ্বব্যাপী সংশয় ছিল। বিপ্লবের পর ১৯১৮-২০'র বছরগুলিতে বিশ্বের প্রতিটি দেশের বিদেশ দপ্তর ও কূটনৈতিক মহল, এবং তাদের সাথে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ নিশ্চিত ছিল — কয়েক মাসের মধ্যেই লেনিনের সরকার ভেঙে পড়বে, বা জবরদস্তি ভেঙে ফেলা হবে; বা কয়েকটা মাস কেটে যাওয়ার পর ভাবা হচ্ছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই এটা ভেঙে যাবে। তারপর, ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট সরকার যখন টিকে গেল এবং কী করে যে টিকল তারা বুঝতে পারল না, তখন বলা হল, টিকে গেলে কি হবে, এই সরকারের বলার মতো সাফল্য কিছুই নেই। সমগ্র রুশ জনগণের চরম দারিদ্র এতটুকুও কমেনি; বিপর্যস্ত কৃষকদের নির্মমভাবে শোষণ করে শহরের শ্রমিক ও লাল ফৌজের পেট ভরানো হচ্ছে। আর প্রত্যেক বছর দেশে দুর্ভিক্ষ আসছে। ১৯৩৪ সালে খাদ্যের প্রাচুর্য যখন আর কোনোমতেই অস্বীকার করা গেল না, তখন অভিযোগ তোলা হল, ওখানে এক নির্মম অত্যাচারী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সার্বিকভাবে বলি দেওয়া হচ্ছে। একনায়কত্ব সম্পর্কে ব্রিটিশ ও আমেরিকান জনগণের অপছন্দকে ব্যবহার করে হিটলারের সঙ্গে স্ট্যালিনকে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

এখন একটা সম্পূর্ণ নতুন মনোভাব চোখে পড়ছে। এখন, এই ১৯৩৬ সালে লোকে জানতে চাইছে — এই যে সংযুক্ত সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র মাত্র বিশ বছরের মধ্যে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে ইউরোপের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত সাড়ে সতেরো কোটি কৃষক ও সবচেয়ে দুর্গত শ্রমিকের ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারল — তা কীসের ভিত্তিতে ? সভ্য দুনিয়ার অন্যত্র কোথাও যা নেই, এই বিরাট সংখ্যক মানুষের জন্য তেমন ব্যবস্থা করা, সত্যিই সম্ভব হচ্ছে কীভাবে? কাজ চেয়ে পায়না এমন বেকারবাহিনী সম্পূর্ণ অনুপস্থিত; জীবনের যে কোন টানাপোড়েনের জন্য সর্বজনীন আর্থিক সুরক্ষা; এবং পিতামাতার জাতি, বর্ণ, ধনীগরিব নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষার কার্যকরী সমান সুযোগ পাওয়ার নিশ্চয়তা কীভাবে সম্ভব হচ্ছে? এই সমস্ত অধিকার ও সুযোগসুবিধাকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি অভূতপূর্ব সংবিধান প্রণয়নের বিস্ময়কর কাণ্ড দেখে পশ্চিমী দুনিয়া এখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে একটা ভিন্ন প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছে। এখন আর তারা ''এ টিকবে কিনা'' এ প্রশ্ন তুলছেনা, প্রশ্ন তুলছে ''এর ভবিষ্যত কী?''

অনেক কিছুই অবশ্য নির্ভর করছে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজেকে রক্ষা করতে পারবে কিনা তার উপর। আমরা ভালো করেই জানি, ক্রেমলিনের কর্তাব্যক্তিরা যুদ্ধ থেকে সরে থাকার জন্য যা যা করা দরকার সবই করবেন। আমার মনে হয়, আমরা এও দৃঢ়ভাবে আশা করতে পারি যে, যুদ্ধ যদি চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে সর্বাধুনিক অস্ত্র, প্রচুর রসদ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লালফৌজ তার যোগ্য জবাব দেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই রাশিয়ারও, অন্যান্য বৃহৎ শক্তির তুলনায়, বাইরের কোনো দেশের দ্বারা পরাজিত হওয়ার বিপদ খুবই কম। এর কোনো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রই সরাসরি বিমান আক্রমণ করে ধ্বংস করা সহজ নয়। এমনকী খুব দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধেও ব্রিটেন বা ফ্রান্স, জার্মানি বা ইতালির তুলনায় আমদানি বন্ধের বা সম্পদ উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটার সমস্যা সোভিয়েট ইউনিয়নের হবে কম। গত পাঁচ বছরে সোভিয়েট ইউনিয়ন তার দূর প্রাচ্যের প্রদেশগুলিকে এমনভাবে সংগঠিত ও সুরক্ষিত করে তুলেছে যে জাপানও বুঝেছে — চীন এবং মঙ্গোলিয়ার দিকে হাত বাড়ানোই বরং ভালো। তাতে একটু ধীরে ধীরে হলেও দখলদারির সম্ভাবনা বেশি। একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে জার্মান সরকার গালাগালি ও কুৎসা রটনায় প্রচুর প্ররোচনা ও মদত দিলেও, ওদেশের ''উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা'' সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ না করাই ভালো মনে করে। এইসব মাথায় রেখে আমি এটা ধরে নিয়েই লিখছি যে, অন্তত আরো কয়েকটা বছর যুদ্ধের কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের অগ্রগতি খুব একটা ব্যাহত হবে না।*

ভবিষ্যতে কী পরিবর্তন আসতে চলেছে তা বুঝতে হলে বর্তমান সময়ের মূল মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করা দরকার। অসংখ্য ছোটখাট ব্যাপারে লন্ডনের মতোই মস্কো অন্যত্র উদ্ভাবিত নতুন জিনিসগুলি কাজে লাগাচ্ছে, সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্ভাবনগুলি তো আছেই। নিওন বাতি, ট্রলি বাস, ট্র্যাফিক সিগন্যালের আলো, ঝরণা-কলম, এক দামের বিক্রয় কেন্দ্র, রেডিও, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, রেডিওতে শ্রুতি নাটক প্রচার ইত্যাদি নিত্যনতুন চালু হচ্ছে বা সম্প্রসারিত হচ্ছে। অন্য দিকে, যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই সমাজ সংগঠনের ধাঁচাটা ক্রমশ স্থায়িত্ব লাভ করছে।

কিন্তু সমাজ সংগঠনের এই কাঠামোটা কেমন? এই দিকটা সহজেই নজর এড়িয়ে যেতে পারে। বেশ কয়েকবার এক এক জন ব্রিটিশ পর্যটক ছুটিতে কয়েকদিন সোভিয়েট ইউনিয়ন বেড়িয়ে আসার পর আমার কাছে এসে একটু বিস্ময়মিশ্রিত হতাশাই ব্যক্ত করেছে, কারণ তারা লন্ডন বা গ্লাসগোর সাথে মস্কোর বা লেনিনগ্রাদের জীবনযাত্রায় কোনো পার্থক্য দেখতে পায়নি। তারা রাস্তায় একইরকম ব্যস্ত মজুরিজীবী ও বেতনভুক কর্মচারীর ভিড় দেখেছে; তারা দেখেছে একইরকম কারখানা এবং বড় দোকানে একইরকম ম্যানেজারদের অনুশাসনে কর্মরত লোক। সেখানে দৃশ্যত ''শ্রমিকদের শাসন'' বা বেতন সাম্য বলে কিছু নেই; পার্কে বসা বা চিত্র-গ্যালারিতে ঘোরা আনন্দ মুখর লোকজন কিংবা মোটামুটি একইরকম থিয়েটার ও সিনেমায় ঢুকে পড়া লোকজনের একইরকম ভিড়। তারা শুনেছে যে, এইসব কারখানা এবং দোকান, সিনেমা, থিয়েটার এবং দারুণ সুন্দর মস্কোর ভূগর্ভ রেল প্রভৃতির মালিক কোনো পুঁজিপতি নয়, সবই চলছে বিভিন্ন ধরনের যৌথ মালিকানাধীনে, ''সরকার''-এর বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ হিসাবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের তাতে কী আসে যায়? যে সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ দেখবার আশা নিয়ে তারা গিয়েছিল সেটা কোথায়?

সোভিয়েট সাম্যবাদের আসল বনিয়াদ

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র সমাজ সংগঠনে যে মৌলিক নতুনত্ব নিয়ে এসেছে তা হল মুনাফাখোর ব্যক্তিমালিক বা অংশীদারি মালিকের অস্তিত্ব এখানে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত দেশে পণ্যসামগ্রী তথা অধিকাংশ জনপরিষেবার উৎপাদন ও বণ্টনের সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব আইন ও প্রথার দ্বারা বর্তায় পুঁজি ও সম্পত্তির আইনসম্মত মালিকের উপর, যে ব্যক্তিই ঠিক করে দেয় কী উৎপন্ন হবে, কী পদ্ধতিতে হবে, কখন এবং কোথায় হবে। এই ব্যক্তিমালিক বা অংশীদারি কোম্পানি মুনাফা অর্জনের ইচ্ছার দ্বারাই চালিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে অন্য প্রতিটি দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মালিকের মুনাফা আদায়। যে ব্যবসায় প্রচুর লাভ হয় তাকে সফল বলে ধরা হয়। লাভ না হলেই ধরা হয় ব্যবসার উদ্দেশ্য ব্যর্থ। সোভিয়েট ইউনিয়নে মুনাফা করা একটি ফৌজদারি অপরাধ। এরজন্য দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়। অন্যত্র যা ব্যবসা বলে চলে সেই কাজ সোভিয়েট ইউনিয়নে মজুরিজীবী বা বেতনভুক কর্মচারীরা করে দেয়, তার জন্য মুনাফা করার উদ্দেশ্য বা মুনাফা করার লোভ উসকে দেওয়ার দরকার হয় না।

মুনাফা অর্জন কাকে বলে?

যে মুনাফা অর্জন সোভিয়েট ইউনিয়নে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত, তার দুটো উপায় আছে, যে দুটোই সব দেশে শুধু সম্পদ বাড়াতে নয়, সাধারণভাবে সভ্রম আদায়েও সাহায্য করে। এই দুই অপরাধমূলক কাজের একটিকে রাশিয়ানরা নিন্দা করে বলে ''ফাটকাবাজি'' (speculation) — যার অর্থ কোনো পণ্য কিনে বেশি দামে বিক্রি করা; অপরটিকে বলে ''শোষণ'' (exploitation) — যার অর্থ কোনো ব্যক্তির কোনো প্রকার শ্রমশক্তি ভাড়া করে (মজুরির পরিমাণ যা-ই হোক) তা দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্য বেচে লাভ করা। সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ বলতে রাশিয়ানরা যা বোঝে তার দ্বারা মূল যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তাহল, স্যর উইলিয়াম বেভারিজের ভাষায় সমাজ দেহের এই ''মার্কসীয় অপারেশন'', অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্য ও চাহিদাকে — তা সেই মুনাফা বেচাকেনার মধ্য দিয়েই করা হোক, বা অপরের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য আত্মসাৎ করেই করা হোক — সমাজ কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

সব কিছুই সরকারি নয়

ফলে সরকারের বিশেষ ধরন বা সম্পত্তি মালিকানার বিশেষ ব্যবস্থা দিয়ে নয়, ফাটকাবাজি বা শোষণ — যে উপায়েই হোক — ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনকে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করার ব্যাপারটা দিয়েই লন্ডন ও গ্লাসগোর সাথে মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মৌলিক পার্থক্যটা বোঝা যাবে। ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ বলতে কী করতে চায় তা বোঝাতে গিয়ে গ্রেট ব্রিটেনে যখন ''উৎপাদন যন্ত্র, বণ্টন ও বিনিময়ের জাতীয়করণ'' এই কথাগুলি প্রচার করা হয়, তাতে জিনিসটা ঠিক ঠিক মতো প্রকাশ পায় না; এমনকী, ফেবিয়ান সোসাইটির প্রভাবে জাতীয়করণের সঙ্গে বিকেন্দ্রীকরণ (municipalization) যোগ করলেও ধারণাটা পরিষ্কার হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত মূলধনী সম্পদের মালিকানা মস্কোর ক্রেমলিনস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার বা সাতটি (এখন এগারোটি হতে যাচ্ছে) প্রজাতন্ত্রী সরকারের উপর তো নয়ই, এমনকি সত্তর-আশি হাজার প্রাদেশিক, জেলা, শহর বা গ্রাম সোভিয়েট বা সমিতিতেও অর্পণ করা হয়নি। এই সরকারি সংস্থাগুলি ও তাদের পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন, ক্রেতা সমবায় সমিতি, অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশাল চিকিৎসা ও হাসপাতাল পরিষেবা ব্যবস্থা, তার সাথে থিয়েটার, পার্ক ও অন্যান্য বিনোদন ও খেলাধুলোর সংস্থা —যাদের সকলেরই আলাদা নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে, এরা সকলে মিলে তিন কোটিরও বেশি লোককে মজুরি বা বেতন দিয়ে কাজে নিয়োগ করেছে এবং তারা সকলেই মোটামুটি সরকারি কর্মচারী। এছাড়াও সোভিয়েট ইউনিয়নে বেশ কয়েক লক্ষ স্বাধীন ও ব্যক্তিগত উৎপাদক ও পেশাজীবী মানুষ রয়েছেন — হস্তশিল্পী, যন্ত্র উদ্ভাবক, স্বাধীন সাংবাদিক ও লেখক, যাঁরা সরকারি পত্রপত্রিকা ও প্রকাশনার জন্য লিখে পয়সা পান; বেতনহীন শিল্পী যাঁরা টাকা-পয়সার বিনিময়ে কাজ করেন; খনিজ সম্পদ নিষ্কাশক; স্বাধীন শিকারি ও মৎস্যজীবী; এবং কিছু কিছু ব্যক্তিগত জমির মালিক কৃষক। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল আর্টেল বা সমবায় উৎপাদনী সমিতির (সম্ভবত) এক বা দু কোটি সদস্য, যাঁরা যৌথভাবে নিজেদের গৃহস্থালীর প্রায় সমস্ত জিনিস তৈরি করেন, জামাকাপড় কেনেন; এই সদস্যরাই বস্ত্র, চর্ম, কাঠ, লোহা এবং ল্যাকার দিয়ে নানা জিনিস তৈরির কর্মক্ষেত্রে কাজ করেন, কেউ কেউ এমনকি নিজেদের ছোটখাট সিসা বা কয়লার খনিতেও কাজ করেন। তবে এদের চেয়েও বেশি সংখ্যায় আছেন আড়াই লক্ষ যৌথ কৃষি ও মৎস্য খামারের (বা কোলখেজি-এর) প্রায় আড়াই কোটি পরিবার, যাঁরা তাঁদের মূল শস্য বা দ্রব্য যৌথপদ্ধতিতে উৎপাদন করেন, এবং শুয়োর ও মুরগি পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, উদ্যান কৃষি, মৌমাছি পালন, শীতবস্ত্র বয়ন ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিতে ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদন চালান।

এরপরেও আমাদেরকে বলা হয়, সমাজতন্ত্রে নাকি রাষ্ট্রই একমাত্র নিয়োগকর্তা! বাস্তব ঘটনা হল, সোভিয়েট ইউনিয়নে বয়স্ক মানুষদের অর্ধেকের বেশিই সরকারি চাকুরে নয় — সুদূরতম অর্থেও নয়। তারা কেউ মজুরি বা বেতন নিয়ে কাজ করে না। তারা কোনও মালিকের অধীনে নয়, স্বাধীনভাবে হস্তশিল্পী, মৎস্যজীবী বা কৃষিজীবী হিসাবে — হয় এককভাবে নিজের এবং পরিবারের জন্য, অথবা যৌথ উৎপাদনের পদ্ধতিতে (আর্টেল বা কোলখোজ) অংশগ্রহণ করে উৎপাদন করে; সরকারকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে বাকিটা স্বাধীনভাবে অন্য ক্রেতার কাছে যতটা সম্ভব ভালো দামে বিক্রি করে। সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনো ব্যক্তির বা অংশীদারভিত্তিক সমবায়ের দ্বারা নিজেদের ব্যবহার বা ভোগের জন্য যত খুশি উৎপাদন করতেও বাধা দেওয়া হয় না; এবং সেই উৎপাদিত দ্রব্য সর্বোচ্চ দাম দেওয়া ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করায়ও আপত্তি নেই — যদি না উৎপাদন বা বণ্টনের কোনো পর্যায়েই অন্যের শ্রম ভাড়া করা হয়। তেমনিই হাজার হাজার যেসব সরকারি সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী আছে, তাদের কারও কাছ থেকে কোনও ব্যক্তি কায়িক শ্রম বা মানসিক শ্রমের জন্য যত উচ্চহারেই ফি বা রয়ালটি, মজুরি বা বেতন পাক না কেন, তাতে কোন আপত্তি নেই।

১৯১৭ সালে লেনিন ও তাঁর সহকর্মীদের স্রেফ যৌথ মালিকানার জন্যই যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠার কোনো বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। পুঁজিপতিরা মজুরি-শ্রমিকদের উপর খবরদারি, উৎপাদনের উপাদান ও পদ্ধতির উপর নিয়ন্ত্রণের জোরে শ্রমশক্তি কিনে নিয়ে যেভাবে মুনাফা করে, তা বন্ধ করতেই রেল, জমি, ব্যাঙ্ক ও কলকারখানা ব্যক্তি-মালিকানার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সামাজিক মালিকানার অধীনে

পাঁচের পাতায় দেখুন

* এর কয়েক বছর পর ১৯৪১ সালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে।

মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

১৯১৭ সালের সাত থেকে সতেরই নভেম্বর, এই দশটি দিন দুনিয়ার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সমাজপরিবর্তনের পথে বিপ্লব যে ঘটে — এটা মানুষের অজানা ছিল না। নভেম্বর বিপ্লবের আগে ঘটেছিল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব, জার্মানি ও ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এইসব গণতান্ত্রিক বিপ্লব নিজ নিজ দেশে বলপ্রয়োগের দ্বারা সামন্তী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সব বিপ্লবই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সচেতন নয়। সামন্তী শোষণে উৎপীড়িত শ্রেণীগুলি একজোট হয়ে অত্যাচারের উৎস সামন্তী ব্যবস্থা খতম করে সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী একটা নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তারা আর একটা নতুন ধরনের শোষণমূলক ব্যবস্থার, বুর্জোয়াব্যবস্থার পত্তন ঘটাল। ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনী সাম্য, স্বৈরাচারের অবসান, সকলের জন্য খাদ্য, শিক্ষা, আশ্রয়, স্বাস্থ্য — যা যা তারা চাইছে নতুন ব্যবস্থা তা পূরণ করতে পারবে কিনা তাও তারা জানত না। তারা জানত সমাজব্যবস্থার অধিপতিরা জনগণের দাবি স্বেচ্ছায় পূরণ করে না। তারা জানত নতুন ব্যবস্থার শিরোমণিদের বিরুদ্ধেও লড়েই দাবি আদায় করতে হবে। লড়াইও চলেছিল বুর্জোয়াদের ক্ষমতা দখলের পর। বুর্জোয়া বিপ্লবে সামিল শ্রমিক-চাষী-মেহনতী মানুষ সামন্তী ব্যবস্থার অবসান ও বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের পর, বিপ্লবের দাবিগুলি পূরণ করার জন্য সদ্য ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করে পূর্ণ সাফল্যের দিকে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সদ্য ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবকে পূর্ণ সাফল্য পেতে দেয়নি। বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় বসেই বুর্জোয়াবিপ্লবে উত্থাপিত জনগণের দাবিকে অস্বীকার করলে। সদ্য হাতে পাওয়া রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সবলে তারা জনগণকে দমন করে বিপ্লব সমাপ্ত করেছিল। তাই আজও অনেকে বলেন — বুর্জোয়া বিপ্লব ব্যর্থ। ১৯৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশতবর্ষে এমন কথাও খোদ ফ্রান্সে জোরালো ভাষায় উঠেছিল যে — কেন আমরা একটা ব্যর্থ বিপ্লবের দ্বিশতবর্ষ পালন করব?

কিন্তু আমরা জানি সে বিপ্লব ব্যর্থ হয়নি। কারণ তা শুধু সামন্তী ব্যবস্থাকেই ভাঙেনি, তা মানুষের চিন্তায় অনড় অচল শাশ্বত ধারণার অচলায়তনও ভেঙেছিল। বিশ্বাসের বদলে অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছিল; ভাবতে শিখিয়েছিল — স্বাধীনতা সকলের জন্মগত অধিকার, কোন রাষ্ট্রব্যবস্থাই ঈশ্বরের বিধানে নির্মিত নয়, চিরস্থায়ী নয়। মানুষই তাকে মানুষের প্রয়োজনে গড়ে তুলেছে। বুর্জোয়া বিপ্লবের সাথে সাথে মানব-ইতিহাসে স্বতঃস্ফূর্ত অসচেতন বিপ্লবের পর্যায় শেষ হল। দাস যুগ থেকে শুরু হয়ে কয়েক হাজার বছরের স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের ধারা বেয়ে শুরু হল সচেতন সংগঠিত বিপ্লবের নতুন যুগ। নভেম্বর বিপ্লব যার প্রথম সফল দৃষ্টান্ত।

বুর্জোয়া বিপ্লবের চিন্তানায়করাই দেখিয়েছিলেন বিদ্যমান সমাজ অবিভাজ্য অখণ্ড সত্তা নয়, তা বিবদমান শ্রেণীতে বিভক্ত, যাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। বুর্জোয়া বিপ্লবের শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক হেগেল দেখান দ্বান্দ্বিক গতির মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই অমোঘ। ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা বলেন — কেবল সামন্তী মালিকানা নয়, সম্পত্তির উপর সব ধরনের ব্যক্তিমালিকানার অবসান চাই। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদেরা দেখান শ্রমই হল সকল ব্যবহারিক সম্পদের উৎস। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের একাধিক আবিষ্কার দেখায় ঐশ্বরিক বিধান হল মনগড়া ধারণা, বাস্তব সত্য নয়। এ সবই মার্কসবাদ জন্ম নেওয়ার জমি তৈরি করে, যার উপর দাঁড়িয়ে মহান কার্ল মার্কস ও তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী এঙ্গেলস ঘোষণা করেন — শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে অবিরত সমাজপরিবর্তনের ধারায় সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের আবির্ভাব অনিবার্য। তাঁরা দেখান, কারো ইচ্ছা বা ষড়যন্ত্রের দ্বারা নয়, শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তব নিয়ম অনুযায়ীই সমাজতন্ত্র অনিবার্য। সবকিছুর মতো ব্যক্তিসম্পত্তি, রাষ্ট্র, শ্রেণী ও ব্যক্তি স্বাধীনতাও অমর শাশ্বত নয়। একদিন এগুলি ছিল না, সমাজ অগ্রগতির পথে এগুলির জন্ম হয়েছে, বুর্জোয়া সমাজে এর বিকাশ চরম বিন্দুতে পৌঁছেছে, অন্তর্বর্তীকালীন সমাজতন্ত্রের পথ বেয়ে সাম্যবাদে উত্তরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসম্পত্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যক্তির সংকীর্ণ গণ্ডী ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে যৌথ রূপ নেবে গুটির সংকীর্ণ বন্ধন থেকে আকাশে মুক্ত প্রজাপতির মতো। শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটবে, রাষ্ট্র অবলুপ্ত হবে।

নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এরই সূচনা ঘটে, পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণের অন্তর্বর্তী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তনের দ্বারা। মানবসমাজে এই প্রথম ঘটে সচেতন বিপ্লব, যে বিপ্লবের নেতৃত্ব জানে কী তাদের করণীয় ও লক্ষ্য, জানে কী কী বিপদ তাদের সামনে এবং সেগুলি পার হওয়ার পথ কোন্‌টা।

অতীতের বিপ্লবগুলি ছিল এক ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে অন্য ধরনের শোষণ, এক শ্রেণীর একনায়কত্বের বদলে ভিন্ন শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। মহান লেনিনের নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লব অতীতের সব বিপ্লব থেকে এক অর্থে মৌলিকভাবে পৃথক। এই বিপ্লব হল সর্বপ্রকার শোষণ, সম্পদের উপর ব্যক্তিমালিকানা, শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীরাষ্ট্রের অবলুপ্তির লক্ষ্যে বিপ্লব। তাই এই বিপ্লবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটি অন্তর্বর্তী স্তর, যা অতীতের বিপ্লবগুলিতে ছিল না। নভেম্বর বিপ্লব ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল বা প্রতিভা কিংবা কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্রের ফসল নয়, যদিও বুর্জোয়ারা সর্বদাই একে বলশেভিক ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করেছে। এর দ্বারা তারা দেখাতে চেয়েছে নভেম্বর বিপ্লব ইতিহাস নির্ধারিত অমোঘ ঘটনা নয়। ''বলশেভিক বিপ্লব'' ইতিহাস নির্ধারিত ছিল বলেই ইতিহাস-নির্ধারিত বিপদ — অর্থাৎ ব্যক্তিবাদ ও প্রতিবিপ্লবের বিপদের সামনে তাকে পড়তে হয়েছে। অন্তর্বর্তী সমাজতান্ত্রিক স্তরে পুঁজিবাদ ফিরে আসার বিপদ যে থাকে, সে সম্পর্কে নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন, পরবর্তীকালে স্ট্যালিন বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। শ্রেণীসংগ্রামকে ক্রমাগত তীব্র করে ব্যক্তিমালিকানা শুধু নয়, সমাজমনন থেকে ব্যক্তিবাদের মূল উৎপাটন করতে না পারলে ক্ষমতাচ্যুত পুঁজিপতিশ্রেণী যে তাকে অবলম্বন করে প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করতে পারে — এটাও সর্বহারার মহান নেতৃবৃন্দ জানতেন এবং বারবার এ সম্পর্কে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে স্ট্যালিন ও চীনে মাও সে-তুংয়ের মৃত্যুর পর সংশোধনবাদীরা দলের নেতৃত্ব কবজা করে। সংশোধনবাদ কী? লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সেতুঙের সুযোগ্য ছাত্র ও অনুগামী সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রাঞ্জল ভাষায় বলেছেন — সর্বহারাশ্রেণীর চিন্তার মধ্যে বুর্জোয়া চিন্তার অনুপ্রবেশই হল সংশোধনবাদ। সর্বহারা পার্টির নেতৃত্ব সংশোধনবাদীদের হাতে যাওয়া যেমন অনিবার্য ছিল না, তেমনি অসম্ভবও ছিল না। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন — সোভিয়েট ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের আদর্শগত চেতনার নিম্নমানের সুযোগ নিয়েই সংশোধনবাদীরা নেতৃত্ব দখল করে। কমরেড ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের দল দেখিয়েছে — সংশোধনবাদের পথ বেয়েই প্রতিবিপ্লবী গরবাচেভ-ইয়েলৎসিন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজসে প্রথমে পূর্ব ইউরোপে ও তারপর সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটায়। একইভাবে তেং শিয়াও পিং চক্র চীনের সমাজতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করেছে।

কিন্তু সোভিয়েতে লেনিন, স্ট্যালিন ও চীনে মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে শিল্প, কৃষি, শিক্ষা স্বাস্থ্য সবদিক থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের যে উন্নয়ন সমাজতন্ত্র ঘটিয়েছিল, ব্যক্তিবাদের ক্লেদ থেকে অনেকাংশে মুক্ত মানুষ গড়ার যে নজির স্থাপন করেছিল — সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় তার গৌরবময় স্মৃতিকে মুছে দিতে পারেনি।

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটাতে পারলে যতটা নিরঙ্কুশ হতে পারবে বলে বুর্জোয়াশ্রেণী মনে করেছিল, ইতিহাসের নিয়মেই তা তারা পারেনি। কারণ মানুষের হাজার হাজার বছরের সংগ্রাম ও জ্ঞানসাধনার নির্যাস আত্মস্থ করে মার্কস শ্রেণীসংগ্রামের যে বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব দিয়েছেন, সমাজতন্ত্রের বর্তমান বিপর্যয় তাকে বদলে দিতে পারে না। তাই দেখা যাচ্ছে, ১৯৯১ সালে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের আঘাতে স্তম্ভিত ভাব কাটিয়ে দুনিয়ার সর্বত্র শ্রেণীসংগ্রাম আবার মাথা তুলছে। বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম তীব্র হচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বেকারি, কর্মচ্যুতি যত বাড়ছে, বিক্ষোভ ও সংগ্রামও তত বাড়ছে। মানুষ আবার নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যের ইতিহাস জানতে চাইছে। বুর্জোয়ারা জোর গলায় যত বলছে মার্ক্সবাদ সেকেলে, মার্ক্সবাদ বাতিল, ততই জীবনের সংকটের পটভূমিতে মার্ক্সবাদের সত্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা দৃঢ়মূল হচ্ছে।

সমাজতন্ত্র অনিবার্য, বিপ্লব অনিবার্য। সমাজ বিপ্লবের বাস্তব নিয়ম অনুযায়ীই সমজতন্ত্র এসেছিল, নেতৃত্বের ভ্রান্ত চিন্তা ও সীমাবদ্ধতার জন্য নিয়মানুযায়ীই তার বিপর্যয় ঘটেছে; ইতিহাসের নিয়মে শ্রেণীসংগ্রামের পথে আবারও তার বিজয় ঘোষিত হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটিয়ে ইতিহাসের সেই অনিবার্যগতিকে রোখা যায় না। নভেম্বর বিপ্লব এই শিক্ষাই দেয়।

নভেম্বর বিপ্লব কী এনেছিল

চারের পাতার পর

নিয়ে আসা হয়েছে। যেটা আরো উল্লেখনীয় তা হল, লেনিন মনে করতেন এবং দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে, মুনাফার জন্য প্রতিযোগিতা ও কামড়াকামড়ির বদলে একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলে শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পাবে। ১৯১৭ সালে পশ্চিমী দুনিয়ার কোনো অর্থনীতিবিদ কল্পনাও করতে পারেন নি যে, প্রতিযোগিতা ও মুনাফা লোটার দরজা বন্ধ করে দেবার ফলে সর্বক্ষেত্রে বেশি করে উদ্যোগ ও সৃজনশীলতা দেখা দেবে, বেতনভোগী শিল্পকর্তারাও অধিক বিনিয়োগ ও আধুনিকীকরণে মনোযোগী হবে; ট্রেড ইউনিয়ন থেকে মজুরি বেঁধে দিলেও কায়িক শ্রমিকদের মধ্যে কাজের আগ্রহ ও শ্রমশীলতা বেড়ে যাবে, এবং পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ এই দেশে অতীতের তুলনায় অবশ্যই মাথাপিছু আয় বল্টন অনেক বেশি হবে। আর এই ১৯৩৬ সালে, বিশ বছরেরও কম সময়ে, সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে তাকিয়ে অর্থনীতি-বিদরা ঠিক এই কথাটাই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিগত দশকে বাকি ইউরোপে মোট জনসংখ্যা যত, রাশিয়ায় লোকসংখ্যা — শত্রুপক্ষের তথাকথিত দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত প্রচার সত্ত্বেও — ঠিক তত পরিমাণে বেড়ে গেছে; তবুও বস্তুগত উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়েই তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ উন্নত হয়েছে। মৃত্যুহার জারের আমলের তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশের নীচে নেমে গেছে, আর শিশুমৃত্যুর হার অর্ধেক হয়ে গেছে। বসতি এলাকায় সমস্ত শিশুরা স্কুলে যায়, এবং আক্ষরিক অর্থেই লক্ষ লক্ষ যুবক কলেজে পড়াশুনো করছে। কিছু কিছু বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যান্য দেশের তুলনায় এগিয়ে গিয়েছে। ১৯৩৪ সালে একটি গ্রামীণ এলাকার স্কুলে গিয়ে একজন পর্যটক দেখেছেন — ১২-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের খুব ভালো করে জার্মান ভাষা শেখানো হয়; এবং তারপর আবিষ্কার করেছেন যে, শহরের প্রতিটি স্কুলে, ইউক্রেনের এমনকী প্রতিটি গ্রামীণ স্কুলে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য অংশে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় গ্রামীণ স্কুলগুলিতে (প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত '৭-বছর' স্কুলে, যা বালটিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত গোটা অঞ্চলে কয়েক বছরের মধ্যেই এক সার্বিক শিক্ষার রূপ গ্রহণ করতে চলেছে), হয় ইংরাজি না হলে জার্মান শেখানো হয়। লজ্জার সঙ্গে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইংলন্ডের একটিও গ্রামীণ স্কুলে কোনো বিদেশি ভাষা শেখানো হয় না। তার দুবছর বাদে, আজ এই ১৯৩৬ সালেও, ইংলন্ডে এরকম একটিও স্কুল গ্রামে নেই।

সোভিয়েট দেশের গ্রামগুলিতে যে বিপুল সংখ্যায় থিয়েটার, কনসার্ট, সিনেমা এবং শিক্ষামূলক আলোচনার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে, আমার পক্ষে এখানে তার সব কথা বলা সম্ভব নয়; বলা সম্ভব নয় সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্যূন একশটি ভাষায় যে বিশাল সংখ্যায় বই এবং পত্রপত্রিকা প্রকাশিত ও বিক্রি হচ্ছে তার কথা, কিংবা সেখানে যে দশ-বিশ হাজার নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার রয়েছে সেগুলোর কথা। শ্রমিকদের ব্যক্তিগতভাবে বীমার অর্থ জমা ছাড়াই ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে তার ব্যাপকতা এবং মূল্য, উভয়ই গ্রেট ব্রিটেন বা অন্য যে কোন দেশের চেয়ে বেশি। আর, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, ১৯৩০ সালের পর থেকে এই বিপুলায়তন দেশের আনাচে কানাচে কোথাও অনিচ্ছাকৃত বেকারি নেই কর্মক্ষম যুবক-যুবতীদের মধ্যে। আশা করা হচ্ছে, বেকার সমস্যা আর দেখা দেবে না। অর্থনীতির এই মৌলিক সমস্যাটির, দাবি করা হচ্ছে, চূড়ান্ত সমাধান হয়ে গেছে। ট্রেড ইউনিয়ন এবং স্থানীয় প্রশাসন প্রতিটি আবেদনকারীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী, ট্রেড ইউনিয়ন নির্ধারিত বেতনে, একটা না একটা কাজ দেবার ব্যবস্থা করে; অথবা, বয়স কম হলে তাদের খরচপত্র দিয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্য কোনো প্রশিক্ষণ সংস্থায় ভর্তি করে দেয়।

তার মানে এই নয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে এখনও মোট যা সম্পদ উৎপাদন হয় তা ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান; বা মাথাপিছু উৎপাদনও যে খুব বেশি তা নয়। কিন্তু সম্পদের বণ্টনে বৈষম্য অনেক কম। এমনকী এটাও প্রমাণ করা কঠিন যে, রাশিয়ার একজন সাধারণ মেকানিক, কারখানার কর্মী, কৃষি শ্রমিক বা মৎস্যজীবী তাদের ব্রিটিশ বা আমেরিকান সহকর্মীর — যখন তাদের নিয়মিত চাকরি থাকে, তাদের মতোই সমান স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। কিন্তু রাশিয়ার শ্রমিক আগে যা ছিল তার তুলনায় এখন অনেক ভালো আছে, বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক উভয় দিকে থেকেই, এবং তার অবস্থা ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। বাস্তবে এটা আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, আর এক দশকের মধ্যেই সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ সাধারণভাবে ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের তুলনায় অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছে যাবে। (চলবে)

ভুল করে শুধু ভুল স্বীকার করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না

ভুল করে ভুল স্বীকার করাটাই বড় কথা নয়, ভুলের কারণ নির্ধারণ করা, ভুলের চরিত্র বিশ্লেষণ করাটা আরও বেশি জরুরি, যাতে এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। সম্প্রতি সিপিএম নেতৃত্ব প্রকাশ্যেই বলছেন, প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি তুলে দিয়ে তাঁরা ভুল করেছিলেন। এই ভুলটি তাঁদের কেন হয়েছিল এ বিষয়ে তাঁরা কোন ব্যাখ্যা আজও জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন নি। তাঁদের এই ভুলের জন্য শিক্ষার যে অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হল, সেই ভুলের মাশুল আজ দিতে হচ্ছে রাজ্যের অগণিত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরকে। কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করা, আর চূড়ান্ত সর্বনাশ করে দিয়ে শুধু মামুলি ভুল স্বীকার করা কোন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের কাজ নয়। তাই ভুল স্বীকার করলেই এতবড় সর্বনাশের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। আমরা মনে করি, শিক্ষার সর্বনাশে আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন মানুষদের ক্ষোভ প্রশমনের এ এক ধরনের চালাকি।

সিপিএম ভুল করে ইংরাজি তুলে দিয়েছিল, একথা কি আদৌ বিশ্বাস্য? ইংরাজি তুলে দেওয়ার সময় নানা কুযুক্তির জাল বিস্তার করে সিপিএম নেতৃত্ব ইংরাজি তুলে দেওয়ার বৈধতা প্রমাণ করার কাজে নেমেছিলেন, বিশ্বের কোন্ কোন্ দেশে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজি পড়ানো হয় না — ইতিহাস ঘেঁটে তা বের করার যে কষ্টকর পথে তাঁরা গিয়েছিলেন, এবং সত্যমিথ্যার ঠিক কেমন মিশেল দিলে ইংরাজি তুলে দেওয়ার পক্ষে জনমতকে দাঁড় করানো যাবে — এতদূর পর্যন্ত যে বুদ্ধিকে তাঁরা খেলিয়েছিলেন, তাঁরা ভুল করে ইংরাজি তুলে দিয়েছিলেন — একথা মানা কষ্টকর। বাংলার প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীগণ সেদিন যখন এর প্রতিবাদ করেছিলেন, যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন ইংরাজি তুলে দিলে শিক্ষার সর্বনাশ হবে — সেদিন সেই যুক্তিতে তাঁরা কর্ণপাত করেননি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভাষাবিদ ডঃ সুকুমার সেনের মতো মানুষকে দুর্বুদ্ধিজীবী বলে কটূক্তি করতেও তাঁদের আটকায়নি। তাঁদের সমস্ত কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে একথা খুব সহজেই বোঝা যায় যে, ইংরাজি তুলে দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর ছিলেন। নিছক ভুল করে তাঁরা ইংরাজি তুলে দেন নি। তাঁদের ইংরাজি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এদেশের বুর্জোয়া কংগ্রেস সরকার প্রণীত শিক্ষানীতির পরিপূরক হিসাবেই এসেছিল।

এদেশের শোষণমূলক বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষা সংকোচনের ঝোঁক স্বাধীনতার পরে পরেই শাসকদল ও গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে তাদের নেতৃত্বে শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি, প্রয়োজন অনুপাতে পর্যাপ্ত স্কুল-কলেজ না খোলা, আসনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ স্কীম চালু করা, শিক্ষায় সরকারি বরাদ্দ কমানো প্রভৃতি চলতে থাকে। বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া প্রভৃতিও ঐ একই শিক্ষাসংকোচন নীতিরই সম্প্রসারণ মাত্র। কারণ, আজও ইংরাজি এদেশে উচ্চশিক্ষার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। এই ইংরাজিতেই দুর্বল করে দিতে পারলে এবং পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে সামগ্রিকভাবে সকল বিষয়ের ভিত্তি (base) ধসিয়ে দিতে পারলে উচ্চশিক্ষায় খুব সামান্য ছাত্রই যেতে সক্ষম হবে। আইন করে উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ না করে উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার উপযুক্ত করে ছাত্রদের গড়ে উঠতে না দেওয়াই শাসকশ্রেণীর কাছে অধিকতর পছন্দ। কারণ, এতে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় না যেতে পারার জন্য সরকারকে দায়ী না করে নিজেদের অক্ষমতাকেই কারণ বলে মনে করবে এবং হীনমন্যতায় ভুগবে। অথচ সরকার যে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের এই অবস্থায় ঠেলে দিল তা তারা ধরতেও পারবে না। সরকার সরাসরি শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করলে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের জন্ম হত, এক্ষেত্রে তার কিছুই হবে না। সেই অর্থেই ইংরাজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া শিক্ষা সংকোচনের একটি অত্যন্ত সুকৌশলী পন্থা এবং ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে সিপিএম সেই কাজটিই করেছিল।

বুর্জোয়াদের চিহ্নিত দল কংগ্রেস স্বাধীনতার কিছুকাল পরেই ইংরাজি তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিল, কিন্তু গণআন্দোলনের চাপে পারেনি। সিপিএম পুঁজিপতিদের বিশ্বাস অর্জনের মরিয়া প্রচেষ্টায় পুঁজিবাদের স্বার্থে কংগ্রেসের সেই অসমাপ্ত কর্মসূচিই সমাপ্ত করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। ফলে ভুল করে নয়, অত্যন্ত সচেতনভাবে এদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নানান ধূর্ততার আশ্রয়ে তারা জনমতকে এবং দলের কর্মী-সমর্থকদের অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও বিভ্রান্ত করে ইংরাজি তুলে দিতে সমর্থ হয়।

শুধু ইংরাজি তুলে দেওয়াই নয়, ডিগ্রিস্তরে সেই সময় বাংলা ভাষাকেও তারা আবশ্যিক-ঐচ্ছিক করে দিয়ে গুরুত্বহীন করে দিয়েছিল। এই আবশ্যিক-ঐচ্ছিক কথাটির অর্থ হল, যে বিষয়টিকে আবশ্যিক-ঐচ্ছিক করা হল, সেই বিষয়ে ফেল করলেও প্রমোশন আটকাবে না। এইভাবে বাংলাকে তারা একটা হাস্যকর জায়গায় নিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, যে সাহিত্যপাঠ মানুষের সুকুমার বৃত্তি জাগাতে সাহায্য করে তাকেও গুরুত্বহীন করে দিল। ফলে যে ভাষাকে বলা হয় চিন্তার বাহন সেই ভাষা শিক্ষাকে (ইংরাজি ও বাংলা উভয়ই) গুরুত্বহীন করে দিয়ে একদিকে চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া, অন্যদিকে সাহিত্য পাঠের গুরুত্ব মেরে দিয়ে সুকুমার বৃত্তিকে ভোঁতা করে দেওয়া এবং এইভাবে মানুষকে সংবেদনশীলতা বিবর্জিত রোবটে পরিণত করার যে প্রয়োজনীয়তা মুমূর্ষু পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী অনুভব করে, সিপিএম তাকেই বাস্তবে রূপ দিতে গেল। সুতরাং, তাদের ইংরাজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার নীতি কোন অবস্থাতেই অজ্ঞতাপ্রসূত ছিল না।

সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীরা জানতেন, ইংরাজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দিলে শিক্ষার সর্বনাশই হবে। তাই এ রাজ্যের সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে তাঁরা ইংরাজি পড়ার অধিকার কেড়ে নিলেও নিজেদের ঘরের ছেলেমেয়েদের ইংরাজি-মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছিলেন। বেসরকারি উদ্যোগে ইংরাজি শেখার স্কুল খোলার অনুমোদনও তাঁরা দিচ্ছিলেন। ইংরাজি শেখার গুরুত্ব বুঝেও তাঁরা সরকারি বিদ্যালয়ে, যেখানে সাধারণ গরিব ও নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানেরা পড়াশুনা করে, সেখান থেকে যেভাবে পরিকল্পিতভাবে ইংরাজি বিদায় দেন — সেটাকে কোন অবস্থাতেই 'ভুল ক্রমে ইংরাজি তুলে দেওয়া হয়েছিল' ভাবা যায় না। বরং বলা উচিত, গরিব ও নিম্নবিত্তদের কাছ থেকে ইংরাজি শিক্ষার অধিকার হরণ করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁদের প্রয়াত এক নেতার কথা থেকেও এ কথা বেরিয়ে আসে। তিনি বলেছিলেন, 'চাষা-ভুষার ছেলেমেয়েদের ইংরাজি শেখার কী দরকার।' ফলে সিপিএম চাইছিল ইংরাজি শিক্ষার সুযোগটা এদেশের উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তানদের জন্য কুক্ষিগত থাকুক, যাতে করে উচ্চশিক্ষা ও সংকুচিত চাকরির ন্যূনতম ছিটেফোটা সুযোগসুবিধাটুকু মূলত ইংরাজি-জানা এইসব বড়লোকের সন্তানেরাই পেতে পারে। এই কুমতলব নিয়েই বুর্জোয়াশ্রেণী ও উচ্চবিত্তশ্রেণীর স্বার্থে সিপিএম অত্যন্ত সচেতনভাবে সরকারি দমন শক্তি ও সংগঠিত দলীয় শক্তি ব্যবহার করে সমস্ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে দু'পায়ে মাড়িয়ে ইংরাজি তুলে দেয়।

কিন্তু আমাদের দল এস ইউ সি আই, সর্বহারার মহান নেতা এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে ইংরাজি ফিরিয়ে আনার আন্দোলন চালিয়ে যায়। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, **''বাস্তবে জ্ঞানজগতকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করেছে সর্বযুগে শোষিত সম্প্রদায় তাদের বাঁচার তাগিদেই। কারণ যুগে যুগে শোষিতশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নটি সমাজের ক্রমবিকাশ ও সমাজবিপ্লবের প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বলেই সত্য জানবার সত্যিকারের প্রয়োজন শোষিতশ্রেণীর। আর শোষকশ্রেণীর সত্যকে চাপা দেওয়াই কাজ''** (সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন্ পথে)। ফলে সিপিএম যখন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার পথ চাষাভুষা তথা গরিব মানুষের কাছে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগল তখন এস ইউ সি আই এর প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলে। দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে এই আন্দোলন কখনও ধীর গতিতে কখনও প্রবল গতিতে চলতে থাকে। পাশাপাশি জনসাধারণও অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারেন, শিক্ষার কী সর্বনাশই না হয়ে গেছে। ফলে জনসাধারণও ক্রমে ক্রমে আন্দোলনের পথে সরব হতে থাকে। সিপিএম দলের ভেতরেও প্রবল চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। প্রশ্ন উঠতে থাকে, এ কেমন বৈষম্যবাদী ব্যবস্থা, যেখানে দলের মন্ত্রী ও ধনী নেতাদের ছেলেমেয়েরা ইংরাজি শিখবে, আর গরিবের ঘরের ছেলেমেয়েরা তার থেকে বঞ্চিত হবে? এস ইউ সি আই ইংরাজি চালুর দাবিতে লাগাতার গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ব্যাপক গণউদ্যোগ সৃষ্টি করে প্রবল চাপ দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে এক কোটি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে মহামিছিল সংগঠিত করে এবং ঐ বছরই ৩ ফেব্রুয়ারি স্বতঃস্ফূর্ত ঐতিহাসিক বাংলা বন্ধ পালিত হয়। অবশেষে বামফ্রন্ট প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করতে না পেরে প্রাথমিকে ইংরাজি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়।

আজ এত বছর পর তারা বলছে, তাদের ভুল হয়েছিল। তাদের এই স্বীকারোক্তি কি যথার্থ? যদি সত্যিই তারা ভুল বুঝে থাকে, তাহলে তো তারা প্রাথমিকে ভাল করে ইংরাজি শেখানোর ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সেটা তারা করছে না। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে ইংরাজি বই দেওয়া হয়েছে সেটা কি যথার্থই বিজ্ঞানসম্মত? সিলেবাস নিয়ে শিক্ষকদের বিস্তর অভিযোগ প্রায়ই খবরের কাগজে আসছে। এসব তারা দূর করার ব্যবস্থা করছে না কেন? ইংরাজি পড়ানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করছে না কেন? এই কি তাদের সত্য বোঝার নমুনা?

আজ অবস্থার চাপে পড়ে ভুল স্বীকার তাদের করতে হচ্ছে। কিন্তু ভুল সংশোধনের কী ব্যবস্থা তারা নিয়েছে? উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় স্পোকেন ইংলিশ শেখানোর উপর জোর দিয়েছেন। একে আর যাই হোক ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া বোঝায় না। ভুল থেকে তারা যথার্থই যদি শিক্ষা নিত তাহলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পুনরায় পাশফেল প্রথা বাতিল করার নয়া ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাততো না। তাদের এই বারংবার 'ভুল' করা থেকে দেশকে বাঁচাতে তাই জনসাধারণকে সদাসতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে ওরা বার বার ভুল করছে, কারণ ওরা ভুল পথেই চলছে।

বাংলা বন্‌ধ সফল করুন

একের পাতার পর

সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশি ও বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই দাম বাড়িয়েছে। এটাও সকলের জানা দরকার আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এখন যত, ভারতবর্ষে তার দাম দ্বিগুণেরও বেশী। এর কারণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অত্যধিক হারে তেলের উপর ট্যাক্স চাপিয়েছে, যেটা প্রত্যাহার করলে দাম অনেক কমে যায়। এটাও জানা দরকার সিপিএম শাসিত পশ্চিমবঙ্গে তেলের উপর ট্যাক্স অন্যান্য অনেক রাজ্যের থেকেও বেশি। পশ্চিমবঙ্গে ট্যাক্স ২৫% অথচ প্রতিবেশী আসামে ১২%। সিপিএম নেতৃত্ব লোকঠকানোর জন্য ভাব দেখাচ্ছে যেন তারা কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। অথচ এটা কে না জানে সিপিএম নেতৃত্বের সম্মতি ছাড়া কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় না এবং নিতে পারে না।

আপনারা জানেন, আমাদের দল গদিসর্বস্ব রাজনীতি করে না, পুঁজিপতি-ব্যবসাদারদের টাকার থলির কাছে নিজেকে বিক্রি করেনি এবং ক্রিমিন্যালভিত্তিক রাজনীতির পথে যায়নি। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের দল বিপ্লব, গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামের রাজনীতি চর্চা করে যাচ্ছে। কমরেড ঘোষ আমাদের নেতা ও কর্মীদের জনগণের প্রতি গভীর দরদবোধ থেকে স্বদেশী আন্দোলনের যুগের বড় মানুষ ও বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনের বিপ্লবীদের থেকে শিক্ষা নিয়ে উন্নত চরিত্র অর্জনের সাধনা করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই আমাদের কর্মীরা পুলিশের লাঠিগুলি ও সিপিএম ঘাতকের আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে বুকের রক্ত ঢেলে প্রাণ বলি দিয়ে এই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রেরণার উৎস জনগণের গভীর ভালবাসা ও সমর্থন। '৯০ সাল থেকে এই পর্যন্ত আমাদের দল জনগণের দাবিতে ৫ বার বাংলা বন্‌ধ ডেকেছে। এই রাজ্যের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুবক-মহিলারা ব্যাপকভাবে সমর্থন করে এই বন্‌ধগুলিকে সফল করেছেন। আমরা বোমাবাজি করে এবং সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করে 'বন্‌ধ সফল'(?) করিনি, জনগণই আমাদের ডাকা বন্‌ধ সফল করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, এবারও জনগণই বন্‌ধ সফল করবেন। ইতিপূর্বে সিপিএম সহ সকল বামপন্থী দলের ও অন্যান্য দলের সৎ কর্মী ও সমর্থকরা আমাদের সকল আন্দোলনগুলিকে ও বন্‌ধগুলিকে সাহায্য করেছেন ; আমরা বিশ্বাস করি এবারও তাঁরা একইভাবে এগিয়ে আসবেন।

বিদ্যুৎগ্রাহকদের সংগঠন অ্যাবেকা ২৫ নভেম্বর সারা রাজ্যে সন্ধ্যে ৬টা থেকে ৬-৩০টা বিদ্যুতের আলো বর্জনের যে কর্মসূচি নিয়েছে, তাকে সফল করার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি। আগামী ডিসেম্বর মাসে জেলায় জেলায় ব্যাপক আন্দোলন চলবে। আগামী ২৮ জানুয়ারি ২ কোটি মানুষের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র নিয়ে এক মহামিছিল কলকাতায় আমরা সংগঠিত করব। এছাড়া আমাদের মহিলা সংগঠন আগামী ১ ডিসেম্বর দিল্লীতে পার্লামেন্ট ভবনের সামনে নানা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করবে। এছাড়া রাজ্য, জেলা, লোকাল স্তরে, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবকদের নানা দাবিতে আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব। এর জন্য প্রয়োজন হাজার হাজার গণকমিটি গঠন, কয়েক লক্ষ সৎ ও নির্ভীক ভলান্টিয়ার এবং সংগ্রামী তহবিল সংগ্রহ।

আমরা বিশ্বাস করি, ১৭ নভেম্বরের কর্মসূচিসহ এই সকল কার্যক্রমকে সফল করার জন্য আপনারা এগিয়ে আসবেন।

ভারত ও মার্কিন সরকার নেপালে হস্তক্ষেপ বন্ধ কর

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপাল। সেই নেপালের জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ঘৃণা শাসকদের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে। তুমুল এই বিক্ষোভকে শাসকদের পক্ষে আর কোনভাবেই চাপা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আন্দোলন এত বলিষ্ঠ ও তীব্র যে শাসকগোষ্ঠীর হিংস্র দমনপীড়ন ও অত্যাচার সত্ত্বেও জনসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী বর্তমান শাসন বিরোধী এই আন্দোলনের দাবি হচ্ছে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নির্বাচিত শাসন পরিষদ (Constituent Assembly) গঠন করতে হবে, সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিতে হবে এবং রাজতন্ত্রের বদলে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই দাবিগুলি আজ নেপালের ব্যাপক জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। সংবাদ অনুযায়ী, নেপালের এই গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী)।

সকলেই জানেন, সুদীর্ঘকাল ধরে নেপালে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের শাসন কাঠামো বজায় রয়েছে। রাজপ্রাসাদ থেকে যদিও অহরহ প্রচার করা হয় যে রাজা সর্বদা জনগণের কথা ভাবেন এবং তিনি জনকল্যাণে নিয়োজিত, কিন্তু জনগণের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চরম শোষণ ও অত্যাচারে জনজীবন চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হলেও রাজপরিবার ও তাদের সহযোগীচক্র কিন্তু ফুলে ফেঁপে উঠছে, তাদের ধনসম্পদ ও সমৃদ্ধি বেড়েই চলেছে। একদিকে নেপালের রাজপরিবার ও তাদের সহযোগীদের বিপুল সম্পদের পাহাড়, অপরদিকে হতদরিদ্র, রিক্ত, নেপালী জনসাধারণের ক্রমান্বয়ে আরও নিঃস্ব হওয়া, এই বিশাল পার্থক্যই প্রমাণ করে শোষণ কী নির্মম, নিদারুণ। এর বিরুদ্ধে মাঝে মধ্যেই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ আন্দোলন হয়েছে যা দমন করতে সামরিক দমনপীড়ন চালানোর পাশাপাশি রাজপরিবার প্রচারের জোরে একটা ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়েছে যে, বহু জাতি গোষ্ঠী অধ্যুষিত নেপালে অনৈক্যের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যেন রাজাই দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করছে, এবং রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়ে গেলে যেন নেপাল তার জাতীয় ঐক্য আর রক্ষাই করতে পারবে না।

কিন্তু এই মোহজাল ছিন্ন হয়ে শাসক রাজার উদার ও মানবিক মুখ-এর মুখোশ খুলে যেতে খুব বেশি সময় লাগেনি। রাজতন্ত্রের অবসান ও পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৯০ সালে গোটা নেপাল জুড়ে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রবল অত্যাচার চালিয়েও রাজা ঐ আন্দোলনকে ধ্বংস করতে পারেননি। শেষপর্যন্ত রাজাকে পিছু হঠতে হয় এবং আলোচনার টেবিলে বসার জন্য রাজি হতে হয়। এই আলোচনায় নেপালে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করার দাবি মেনে নিলেও সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পোষাক পরে রাজা সৈন্যবাহিনীর ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হন। এভাবেই নেপাল রাষ্ট্রের ওপর রাজপ্রাসাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব বহাল রাখা হয়। মূলত নেপালের উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী নেপালী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং সিপিএন (ইউ এম এল) দলের মতো মেকী বামপন্থী দলগুলি তখনকার আন্দোলনে থাকার সুবাদে ঐ আলোচনায় যোগ দিয়েছিল। এরা ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা পাওয়ার লোভে রাজার ঐ প্রতারণামূলক ব্যবস্থাকেই মেনে নেয়। এর দ্বারা জনগণের সংগ্রামের মূল দাবি অর্থাৎ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও পূর্ণ পরিষদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা জনগণের আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। রাজার যে অবস্থান ছিল সেটাই বহাল থেকে যায়।

জনগণ আশা করেছিলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে বুঝিবা তাঁদের সব না হলেও কিছু সমস্যা দূর হবে। বাস্তবে তাঁরা দেখলেন, তাঁদের কোন দুর্দশারই লাঘব পর্যন্ত হল না। অচিরেই সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের রঙিন মুখোশ খসে পড়ে শোষণের চেহারার নগ্ন প্রকাশ ঘটতে থাকে এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। এই জ্বলন্ত সংকট জনমানসে আবার রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকুতি নতুন করে জাগিয়ে দেয়। এর পথ বেয়েই ১৯৯৬ সালে নতুন করে গণআন্দোলনের সূচনা হয় এবং তা ক্রমশ আরও শক্তি সঞ্চয় করে বর্তমানে এই দুর্বার গণসংগ্রামের চেহারা নিয়েছে। ১৯৯০ সালে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এবারের আন্দোলন তারই ধারাবাহিকতা বহন করছে বলা যায়। এমনকী বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিও বলছে, আন্দোলনকারীরা নেপালের প্রায় ৭৫টি জেলাতেই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। শাসকরা সমস্ত রকমের সশস্ত্র দমনপীড়ন ও পাশবিক অত্যাচার চালিয়েও এই আন্দোলন ভাঙতে পারছে না। ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে রাজা, সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় নির্বাচিত দেউবা সরকারকে খারিজ করে দিয়েছিলেন এবং সংসদ ভেঙে দিয়ে সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে শাসনবিভাগের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাজপ্রাসাদ আন্দোলনকে কোনভাবেই দমন করতে পারেনি। অগত্যা গত জুন মাসে রাজা আবার দেউবাকে ফিরিয়ে এনে তাঁর নেতৃত্বে নেপালে একটি বশংবদ সরকার বসিয়ে দিয়েছেন।

এই পটভূমিতেই গত সেপ্টেম্বরে দেউবা তড়িঘড়ি ভারত সফরে এসে, তাঁর ভাষায় 'মাওবাদী সন্ত্রাস' ও 'গণবিদ্রোহ' দমনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের কাছে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি চান এবং তা পেয়ে যান। দেউবা বলেন, ভারত সরকার তাঁদের সঙ্কটজনক অবস্থার কথা বুঝেছে এবং সেজন্য তাঁদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা পোষণ করেছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার তার পূর্বসূরী বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকারের মতই নেপাল সরকারকে গণআন্দোলন দমনে সাহায্য করতে অতীব আগ্রহী। ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে নেপালী জনগণের সংগ্রাম উভয় সরকারের কাছেই 'বিপদের ইঙ্গিত'। তাই ইউ পি এ সরকার নেপালের অত্যাচারী শাসনকর্তাদের বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভারতীয় সেনার নিজস্ব সেনাবহনকারী গাড়িগুলির মধ্য থেকে মাইন নিরোধক গাড়িও নেপালকে দেওয়া হবে। গত বছর বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নেপাল সরকারকে, মর্টার, রাইফেল ও মেশিনগান ছাড়াও আধুনিক হাল্কা হেলিকপ্টার দিয়েছিল যাতে রয়েল নেপাল আর্মি আন্দোলনের ঘাঁটিগুলির উপর আকাশ পথে নজরদারি চালাতে ও আক্রমণ করতে পারে ও এ ব্যাপারে তাদের শক্তি বাড়াতে পারে। নেপাল সেনাবাহিনীর অফিসার ও সেনাদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছেন ভারতের সামরিকবাহিনীর কর্তারা। সংবাদে প্রকাশ নেপালের প্রধানমন্ত্রী দেউবার ভারত সফরের পর ভারত সরকারের উচ্চতম মহলে নেপাল সম্পর্কে 'উদ্বেগ' ব্যক্ত হয়েছে এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে জরুরি আলোচনাও হয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে একইভাবে নেপালকে সাহায্য দিয়ে চলেছে মার্কিন, ব্রিটিশ, বেলজিয়াম প্রভৃতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি।

বস্তুত, স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষক ও আজ্ঞাবহ ভারত সরকারের বহু পদক্ষেপের মধ্যেই শাসকগোষ্ঠীর সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যকামী ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়েছে। আধিপত্যকামী পরিকল্পনা অনুসরণকারী বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেপালে ভালো রকম বাণিজ্যিক স্বার্থ রয়েছে। শুধু তাই নয়, নেপাল ভূখণ্ডকে ভারত যুদ্ধের প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড হিসাবে বিবেচনা করে। নেপালের চারদিকই অন্য দেশ দিয়ে ঘেরা। অপর দেশের ভূখণ্ড অতিক্রম না করে নেপালের মানুষ বিদেশ যেতে পারেন না, পণ্য পরিবহনও সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে নেপাল ভারতের উপর আজও পুরোপুরি নির্ভরশীল। একেই ব্যবহার করে ভারত নেপালের উপর হুকুমদারি করার ক্ষমতা হাতে নিয়েছে। ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল চরম বৈষম্যমূলক ও অসম চুক্তি বাতিল করার জন্য নেপালী জনগণ দীর্ঘদিন ধরে দাবি করলেও ভারত তা বরাবর অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে। উপরন্তু সীমান্তে নেপালের যাতায়াতের জন্য মাত্র দুটি স্থান খোলা রেখে এবং পরিবহনের সাথে যুক্ত করে বাণিজ্য চুক্তি করার বাসনা প্রকাশ করে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ভারত সরকারের মাধ্যমে নেপালের উপর ক্রমাগত চাপ দিয়েছে যাতে ভারতের হুকুমের কাছে নেপাল মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। একটি দেশের সার্বভৌমত্বের উপর এগুলি স্পষ্টতই নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত এবং এর মধ্যে আগ্রাসী নীতির দ্বারা অন্যকে পদানত করার বাসনাই প্রতিফলিত হয়। ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর এ ধরনের প্রভুত্বসুলভ আচরণ সমস্ত প্রতিবেশী দেশগুলির ক্ষেত্রেই দেখা যায়। শ্রীলঙ্কার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে রাজীব গান্ধী সরকারের হস্তক্ষেপ, তামিল সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের সাথে চুক্তি করতে শ্রীলঙ্কাকে বাধ্য করা ও শেষপর্যন্ত এল টি টি ই-কে ধ্বংস করতে শান্তিরক্ষী বাহিনীর নামে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সেনা প্রেরণের পর থেকে প্রতিবেশী দেশগুলির জনসাধারণ ভারতকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। এই আচরণ দুটি প্রতিবেশী দেশের জনসাধারণের মধ্যে অনাবশ্যক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং দুই দেশের জনগণের ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কে ফাটল ধরায়। নেপালের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। আপসকামী নেপালী কংগ্রেস এবং সুবিধাবাদী বামপন্থী সিপিএন (ইউ এম এ)কে সমর্থন জানিয়ে এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে শক্তি জুগিয়ে ভারত সরকার ইতিমধ্যেই ন্যায় ও শান্তিকামী নির্যাতিত নেপালী জনগণের চোখে বহুলাংশে শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়ে ভারত সরকার নেপালের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর একটি পণ্যবাহী মার্কিন বিমান নেপালে মার্কিন দূতাবাসের জন্য অস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ে কাঠমাণ্ডু যাওয়ার পথে আমেদাবাদে অবতরণ করে। দিল্লিতে এক মার্কিন মুখপাত্র এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, মার্কিন স্বরাষ্ট্রদপ্তর নেপালী পুলিশবাহিনীকে সন্ত্রাসবাদীদের উপযুক্তভাবে মোকাবিলার জন্য ট্রেনিং দিচ্ছে, এবং এই উদ্দেশ্যেই ঐ বিমানটিতে অস্ত্রসম্ভার নেপালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ভারত সরকারও স্বীকার করেছে যে, নেপালে মার্কিন অস্ত্রসম্ভার সরবরাহের খবর তারা জানে এবং আবশ্যিক কিছু নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুসন্ধান চালিয়ে বিমানটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সংবাদে আরও প্রকাশ, ভারত ও মার্কিন সরকার যৌথ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নেপালকে তারা অস্ত্র সাহায্য দেওয়া চালিয়ে যাবে। বিধ্বংসী অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহ করবে মার্কিন সরকার এবং ভারত দেবে হেলিকপ্টার ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিস।

বিগত ৮০'র দশকের শেষ দিক থেকেই মার্কিন শাসকরা নেপালের রাজতন্ত্রকে সরাসরি সাহায্য দিয়ে আসছে, যাতে রাজাকে পুতুলের মতো ব্যবহার করা যায়। ভারত ও চীনের ওপর নজরদারি চালাতে ও নানা গোয়েন্দা কার্যকলাপের ক্ষেত্রে নেপাল ভূখণ্ড যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা মার্কিন শাসকদের ভালই জানা আছে। অস্ত্র সরবরাহ, নেপালের সৈন্যবাহিনীর জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ, তথাকথিত বিদ্রোহ আটকাবার জন্য অবাধে ডলার প্রদান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মার্কিন প্রভাব এখন নেপালে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন মন্ত্রণাদাতাদেরও পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য অস্ত্রসম্ভারের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০০০ এম-১৬ এ ২ রাইফেল নেপালী সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়েছে যাতে রাজতন্ত্রের অবসান ও পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করা যায়। অধিকন্তু ওয়াশিংটনের শাসকরা দেখাতে চায় যে, নেপালের রাজতন্ত্র হচ্ছে একতা ও স্থায়িত্বের প্রতীক এবং তার অধীনস্থ নেপালের সৈন্যবাহিনী 'সন্ত্রাসবাদ'কে

আটের পাতায় দেখুন

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। পাশে কমরেডস্ অসিত ভট্টাচার্য, মানিক মুখার্জী ও প্রতিভা মুখার্জী

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

নেপালে হস্তক্ষেপ বন্ধ কর

সাতের পাতার পর

নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন গোপন সংস্থা মার্কিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য জেমস্ ফ্রান্সিস মোরিয়ারটিকে নেপালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করাটাও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কিন শাসকরা এমন দাবিও করেছে যে, বিদ্রোহীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আলোচনার টেবিলে বসাবার উদ্দেশ্যেই নাকি মার্কিন শাসকরা নেপালে অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে। কিন্তু অভিজ্ঞ মার্কিন কর্তারা অতি দ্রুত বুঝে ফেলেছে যে, জনগণের পূর্ণ সমর্থনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করে দেওয়া নেপাল সৈন্যবাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সহসচিব ক্রিস্টিনা রোকা তাদের এই দুশ্চিন্তার কথা গোপন করেননি। এতকাল 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এই ধূয়া তুলে নেপালের গণআন্দোলনকে দমন করার জন্য রাজাকে সাহায্য সহায়তা দেওয়ার যে পথ নিয়েছিল আমেরিকা, তাতে ব্যর্থ হয়ে এখন তারা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। কাঠমাণ্ডুর পথে-ঘাটে সশস্ত্র লড়াই তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। তাই এখন নেপালী কংগ্রেসসহ অন্যান্য দল ও গোষ্ঠী, যারা তথাকথিত সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সমর্থক, তাদের সাথে রাজার আঁতাত করিয়ে দিয়ে একটা জোড়াতালি সরকার খাড়া করে, তাকেই ঢাল হিসাবে রেখে বর্বর অত্যাচার চালিয়ে নেপালের গণসংগ্রামকে গুঁড়িয়ে দিতে চায় আমেরিকা। বোঝা যায়, নেপালের জনগণের আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য আমেরিকা কূটনৈতিক পরিকল্পনা আঁটছে। এককথায় দেশে দেশে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ, অন্তর্ঘাত, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি যেসব সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ বিশ্বজুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চালায়, নেপালেও সেটাই ঘটছে।

পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবিতে নেপালের জনগণ যে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তাকে অভিনন্দন জানাবার পাশাপাশি আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বর্তমান মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে জনগণের সকল ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকেই এমনভাবে গড়ে তোলা দরকার যাতে তা পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপূরক হয়। অন্যথায়, হাজারো আত্মত্যাগ ও জনসমর্থন সত্ত্বেও সকল আন্দোলনই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আমরা পুনরায় দাবি জানাচ্ছি যে, ভারত সরকারকে অবিলম্বে নেপালের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। নেপালের জনগণের হাতেই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার ছেড়ে দিতে হবে। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ধারাবাহিকতার বাহক ভারতের সাধারণ মানুষ ভারতের বুর্জোয়া সরকারের নেপালের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের ঘৃণ্য ভূমিকা কিছুতেই মেনে নেবে না এবং প্রয়োজনীয় জঙ্গি গণআন্দোলন গড়ে তুলে ব্যর্থ করবে ভারত সরকারের এই জঘন্য প্রয়াস। গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে নিয়োজিত নেপালের সাহসী ও সংগ্রামী জনগণের পাশে দাঁড়াতে এবং নেপালের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারত সরকার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য হস্তক্ষেপকে পরাস্ত করতে গোটা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রেমী জনগণকে এগিয়ে আসতে আমরা আহ্বান জানাই।

পেট্রোপণ্যের অন্যায় মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলুন

— নীহার মুখার্জী

কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় বসার ছ মাসের মধ্যে তৃতীয় দফা পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা করার সাথে সাথে ৫ নভেম্বর এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এক বিবৃতিতে সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। সরকার যথারীতি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখাতে বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধির পুরনো অজুহাতের ধুয়া তুলেছে, কিন্তু সংবাদেই জানা গেছে বাস্তবে বিশ্ববাজারে তেলের দাম এখন কমছে। সরকার যদি চাইতো তবে কর কমিয়ে এদেশে তেলের দাম অবশ্যই কমাতে পারত। কিন্তু কেন্দ্র সরকার ঠিক বিপরীত পথ গ্রহণ করেছে এবং সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি দামের বোঝা কমানোর যাবতীয় প্রস্তাব উপেক্ষা করে আর এক দফা মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। তেল ব্যবসায়ী বহুজাতিক কোম্পানিগুলির একতরফা দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার বিশ্বজনমত গড়ে তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছে না। বরং ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকালে পিষ্ট যে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কার্যত শূন্যে ঠেকেছে, তাদের কাঁধেই মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।

সিপিআই(এম) ও সিপিআই, যাদের সমর্থনে ভর করে কেন্দ্র সরকার খাড়া রয়েছে, তাদের দ্বিচারিতার সমালোচনা করে কমরেড মুখার্জী বলেছেন — চরম দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের ক্লেশ আরও বাড়ানোর এই সিদ্ধান্তকে তারা ভেতরে ভেতরে সবুজ সঙ্কেত দিয়ে বাইরে বিরোধিতার ভেক ধরেছে। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির এই চরম জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করার জন্য দেশব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য সর্বস্তরের জনগণের নিকট তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

ক্যাপিটেশন ফি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাতিল হওয়ার পর মেধা তালিকার ভিত্তিতে ছাত্রভর্তির দাবিতে ৪ নভেম্বর ডি এস ও-র উদ্যোগে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের অনশন।

বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল ও বকেয়ার বোঝা প্রত্যাহার, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এবং জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের দাবিতে

২৫ নভেম্বর

সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬-৩০মিঃ

বৈদ্যুতিক আলো বর্জন করুন

জানেন কী

- বিশ্ববাজারে তেলের দাম সম্প্রতি ব্যারেল প্রতি ৫৬.৬ ডলার থেকে কমে হয়েছে ৪৯ ডলার। এক ব্যারেলে গড়ে ১৫৯ লিটার তেল থাকে। এই হিসাবে টাকার অঙ্কে ১ লিটার পেট্রলের দাম হয় ১৩.৮৬ টাকা। শোধন-পরিবহনের সামান্য খরচ ধরে ভারতে দাম দাঁড়াতে পারে লিটার প্রতি ১৫ টাকার মতো। সরকার দাম স্থির করেছে ৪২.১০ টাকা। এই বাড়তি প্রায় ২৭ টাকা নেওয়া হচ্ছে নানা সরকারি ট্যাক্স ও সেস্ চাপিয়ে। যেটা দিচ্ছে সাধারণ মানুষ।
- রান্নার গ্যাসে সিলিন্ডারে ১৫৮ টাকা ভরতুকির কথা বেশ কয়েক বছর ধরেই বলা হচ্ছে। অথচ ইতিমধ্যে কয়েক দফায় গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে, তারপরও ভরতুকির পরিমাণ একইরকম থাকে কি করে ? তাছাড়া, পুঁজিপতিদের যখন হাজার হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড়, বিনামূল্যে বা কম মূল্যে বিদ্যুৎ-জল-জমি দেওয়া হয়, তখন ভরতুকিতে আপত্তি তোলা হয় না কেন ? সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যে সামান্য কিছু ভরতুকি দিতেই এত আপত্তি কেন ?
- তেল ব্যবসা থেকে তোলা ১ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার তেল উৎপাদনে ব্যয় না করে খেয়ে নিয়েছে।

রান্নার গ্যাস, পেট্রল, ডিজেল এবং বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার সহ ১২ দফা দাবিতে

১৭ নভেম্বর

বাংলা বনধ

SUCI

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net